শহীদ

শহীদ হালিম, রহমত
বিমান, আমান স্মরণে

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

শহীদ

শহীদ হালিম, রহমত
বিমান, আমান স্মরণে

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী

শহীদ

শহীদ হালিম রহমত বিমান আমান স্মরণে

প্রকাশকাল ঃ

৫ আশ্বিন ১৪০১
১৩ রবিউস সানি ১৪১৫
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

সম্পাদক :

শেখ মুরাদ হোসেন

সম্পাদনা সহযোগী ঃ

গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান
কম্পোজ ঃ প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৯৫৪০, ৮৪১৭৫৮
অলংকরণ ঃ শিল্পকোন, মগবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ ঃ আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

আমরা তোমাদের ভুলবো না

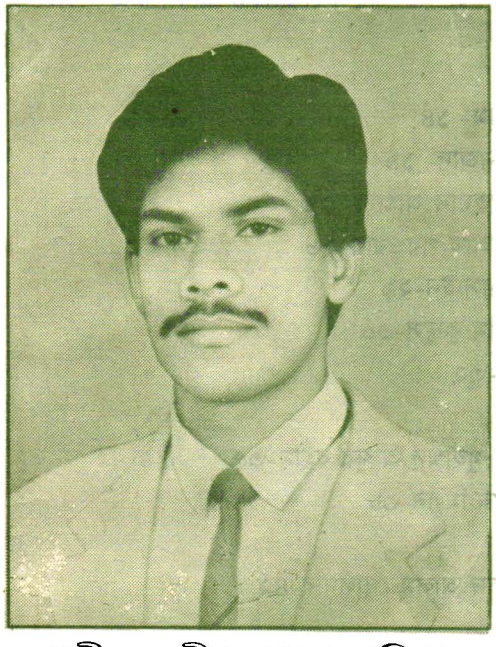

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

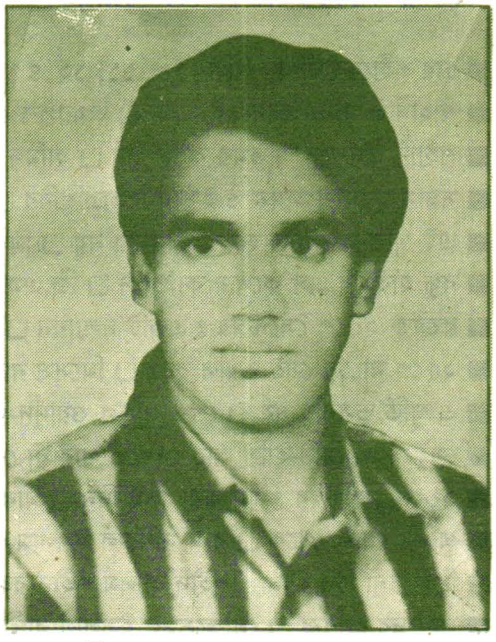

শহীদ শেখ রহমত আলী

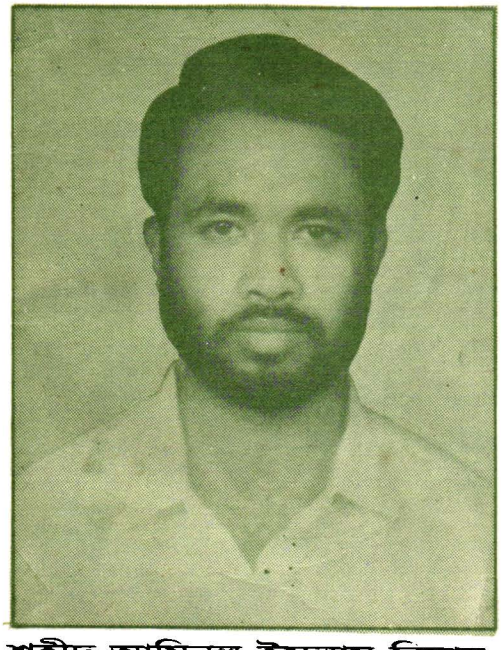

শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান

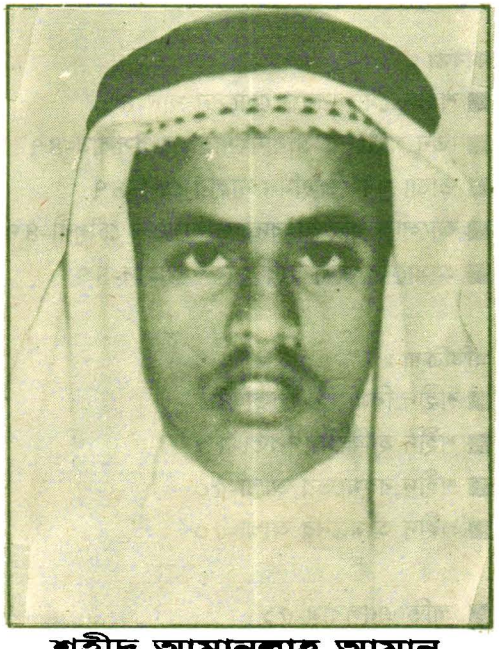

শহীদ আমানুল্লাহ্ আমান

www.pathagar.com

সূচী

■ চার শহীদের জীবন পঞ্জী- ১০, ১১, ১২ ও ১৩
■ শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য ❑ অধ্যাপক গোলাম আযম- ১৪
■ শহীদি জনপদে স্মৃতিময় ক'টি দিন ❑ হামিদ হোসাইন আজাদ- ১৯
■ সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও ইসলামী ছাত্রশিবির ❑ হামিদুর রহমান আজাদ- ২৩
■ এই স্মৃতি অদম্য সাহসের-বেদনার নয় ❑ মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার-২৬
■ বন্ধু হারা বি,এল কলেজ ক্যাম্পাস ❑ জি,এম ইলিয়াস হোসাইন-২৯
■ রক্তাক্ত ২০শে সেপ্টেম্বর ঃ একটি মূল্যায়ন ❑ মিয়া গোলাম কুদ্দুস-৩০
■ ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি ❑ মিসেস নাসিমা খানম-৩২
■ এ স্মৃতি ভুলবার নয় ❑ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ-৩৩
■ সেই সরল মিষ্টি হাসি আর দেখতে পাব না কোন দিন ❑ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম-৩৫
■ ২০শে সেপ্টেম্বর ঃ খুন ঝরা সেই দিন ❑ মাকসুদুর রহমান মিলন-৩৮
■ স্মৃতির পাতা থেকে ❑ ব,ম মনিরুল ইসলাম- ৪১
■ চির চেনা চির জানা ঃ শহীদ হালিম শহীদ রহমত ❑ মাসুদ আলম গোলদার-৪২
■ শহীদের প্রেরনা ❑ মোকসেমুল ইসলাম বাপ্পী- ৪৩
■ আজো এলোমেলো ❑ মুন্সী আব্দুল হাফিজ কচি-৪৫

কবিতা ঃ

■ শহীদ-মোশাররফ হোসেন খান-৪৬
■ তিন শহীদের আযান-সাইফুল ইসলাম-৪৭
■ তাজা খুন-জেসমিন নাহার জেবু-৪৭
■ আলোক বর্তিকা-বদরুল হায়দার চৌধুরী-৪৭
■ আমানের জন্য হারুন বিন্ আহাদ-৪৭

প্রতিক্রিয়া ঃ

■ শহীদ বিমানের পিতা-৪৮
■ শহীদ হালিমের পিতা-৫০
■ শহীদ রহমতের আম্মা-৫০
■ শহীদ আমানের আম্মা-৫০

■ স্মৃতি এ্যালবাম-৫১

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী

খুলনার চার শহীদ বিমান-হালিম-রহমত-আমান স্মরণে স্মরণিকা প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভারতের সেবাদাস ঘাদানি চক্র আর বিসমিল্লাহর ধ্বজাধারীরা আমাদের মাঝ থেকে প্রাণপ্রিয় এ ভাইদের কেড়ে নিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। সেদিন খুলনার মাটিতে যে বর্বর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল তা দেশের ইতিহাসে নজীরবিহীন। খাবার টেবিলে আমানকে পাখির মত গুলী করে হত্যা করেছে নরপশুরা। বিমান ছিল রোজাদার, তাকে পিটিয়ে মাথা গুড়ো করে দিয়েছে ওরা। আবদুল হালিম ভাইকে মসজিদ থেকে টেনে বের করে জবাই করে শহীদ করেছে কসাইরা। রহমত ভাইকে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে করেছে ক্ষতবিক্ষত। এ নির্মমতা, পাশবিকতার নিন্দা জানানোর ভাষা সেদিন হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের ভাইদের কোন অপরাধ ছিল না। শুধু আল্লাহর উপর ঈমান আনা ছাড়া। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যারা গলাবাজি করে তাদের জঘন্য সন্ত্রাসী চেহারা দেখে জাতি হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বছর ঘুরে সেই কালো দিনটি আবার এলো আমাদের সামনে।

ইসলামী ছাত্র শিবির হচ্ছে শহীদী কাফেলা। সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর রয়েছে শাহাদাত লাভের তীব্র আকাংখা। কারণ এ নশ্বর পৃথিবীর অবসানের পর অবিনশ্বর আখেরাতে শহীদদের রয়েছে বিরাট মর্যাদা। হাদীসে রসুল (সাঃ) বলেছেন, জান্নাত লাভের পর কেউই পুনরায় পৃথিবীতে আসতে চাইবে না, কেবলমাত্র শহীদ ছাড়া। শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদার আকাংখাই শহীদকে পুনরায় পৃথিবীতে এসে শাহাদাত বরণ করার প্রেরণা যোগাবে। সন্ত্রাসের মোকাবেলা ইসলামী ছাত্রশিবির ধৈর্য্য, সাহসিকতা, আদর্শ ও চরিত্র দিয়েই করবে, সন্ত্রাস দিয়ে নয়। আমাদের বিশ্বাস সন্ত্রাসীরা তাদের প্রজ্জলিত সন্ত্রাসের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সে সময় এখন আর বেশী দূরে নয়।

শাহাদাত বার্ষিকীতে আমাদের বেশী স্মরণ রাখতে হবে শহীদদের অসমাপ্ত কাজের কথা, যারা জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে গেল তাদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। তাই পূর্ণ আমানতদারীতার সাথে আন্দোলনের কাজকে সাফল্যের মাকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে দিতে হবে। দোয়া করতে হবে শহীদদের জন্য; আল্লাহ যেন তাঁদের শাহাদাত কবুল করেন, তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ কায়েম করেন।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে আমি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের পথে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান

কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির বাণী

শহীদ বিমান-হালিম-রহমত-আমান স্মরণে খুলনা মহানগরী শাখা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। মর্দে মুজাহিদ হযরত খান জাহান আলীর পূন্য স্মৃতি বিজড়িত নগরী খুলনা। ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক খুলনা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শহীদ বিমান-হালিম-রহমত-আমানের শাহাদাত সময়ের ধারাবাহিকতায় সে ইতিহাসে আর এক গৌরবময় সংযোজন। সে গৌরব মিথ্যার স্মরণে মাথা নত না করার, সত্যর জন্য জীবনের শেষরক্ত বিন্দু ঢেলে দিয়ে মহা সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার।

বাংলাদেশের সবুজ ভুখন্ডে পূর্নাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আপোসহীন কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। মানুষের মনগড়া আদর্শের শাসন ও শোষনের নাগপাশ ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর প্রভূত্ব ও রসুল (সাঃ) এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত শিবিরের বিপ্লবী অংগীকার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রতি সাধারণ ছাত্রদের বিপুল আগ্রহ সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়। গ্রহণ যোগ্য কোন আদর্শ ও চরিত্র না থাকায় মানব রচিত মতাদর্শের পতাকাবাহীরা শিবিরের আদর্শ চরিত্রের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। নানা রকম মিথ্যা প্রচারনা, লোভ, হুমকী প্রদর্শন করেও শিবিরের অগ্রযাত্রা রোধে ব্যর্থ হয়ে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৬৬জন নেতা-কর্মীর শাহাদাত ইসলাম বিদ্বেষীদের ঘৃন্য সন্ত্রাসের বেদনাদায়ক উপাখ্যান।

শহীদ বিমান-হালিম-রহমত-আমানের শাহাদাত খুলনার শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র অঙিনায় রক্তের লাল প্রলেপ। কি অপরাধ তাঁরা করেছিল? আল্লাহর দ্বীনের পতাকা বহন ছাড়া অন্য কোন অন্যায় তাঁরা করেনি। ঘাতকের নির্মম আঘাত এ যুবকদের আমাদের কাছ থেকে, জাতির কাছ থেকে চিরতরে কেড়ে নিল।

মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, বোনের আহাজরি, স্বজনদের চোখের পানি সবকিছুকেই ঘাতকরা উপেক্ষা করেছে পশুশক্তিতে। শহীদ বিমান, মুন্সী আব্দুল হালিম ও শেখ রহমত আলীকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে। নিরহংকার, অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তাঁরা সংগঠনের আনুগত্য ছিল তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর দ্বীনের দায়ী হিসাবে তাঁরা ছিলেন বাতিলের চক্ষুশুল। তাই রোজাদার বিমান, মসজিদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী হালিম, হলের কড়িডোরে একাকী রহমত আর খাবার টেবিলে এতিম আমান তাদের মনে কোন করুনা সৃষ্টি করতে পারেনি, আদিম পাশবিকতা ছাড়া।

সৃষ্টির শুরু থেকে চলছে শহীদি মিছিল। এ মিছিল চলে গেছে জান্নাত পর্যন্ত। শহীদ বিমান-হালিম-রহমত-আমান সে মিছিলে অক্লান্ত সাথী। জান্নাত তাদের স্থায়ী ঠিকানা। শহীদ মালেক থেকে শুরু করে শহীদ কামরুল পর্যন্ত শিবিরের শহীদি সম্মেলনে আমরা শামিল হতে না পারলেও আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা শামিল হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের নেতা, অনন্ত জীবনে চিরসুন্দর অবস্থানে।

আল্লা মা ইকবাল বলেছেন, "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ", আজ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জনপথ এক একটি কারবালা। আমাদের শহীদরা সে ময়দানের সাহসী যোদ্ধা। বারো আউলিয়ার এদেশে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ইসলামের সোনালী সুর্য্যের সুপ্রভাত এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। শাহাদাতের দূর্বার আকাংখায় আজ হাজার যুবক ব্যাকুল। তাদের সকলের একই দোয়া "আল্লাহ তুমি নিতে পার, গোলাম মোদের আছে আরো।" তাই খুলনার চার শহীদের পথ ধরে খানজাহানের খুলনায় তওহীদের উত্তাল তরঙ্গে খোদাদ্রোহী জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী আর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের স্বপ্নের মসনদ তখনই তছনছ হয়ে যাবে। আমরা সেদিনের প্রতিক্ষায় জেগে আছি সারাদিন সারা রাত।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শেখ কামরুল আলম
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

মহানগরী সভাপতির কথা

৯৩ এর ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনায় যা ঘটে গেছে তা এই জনপদে সংগঠিত অতীতের যে কোন হত্যা কান্ডকেই ম্লান করে দিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে আল্লাহর ঘর মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী এবং আহাররত ইয়াতীমকে যারা পাশবিক বর্বরতায় হত্যা করেছে মানুষ নামের সেই কুলাংগারদের নিন্দে জানানোর কোন ভাষা আমাদের জানা নেই। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধেও আমরা বিশ্ববাসী নই। আমাদের একটিই শান্তনা, তাহলো আমরা শহীদদের গর্বিত উত্তরসূরী। কিয়ামতের ময়দানে আমাদের চীর চেনা শহীদ আঃ হালিম, শেখ রহমত আলী আমিনুল ইসলাম বিমান এবং আমানুল্লাহ যখন টগবগে খুনে ভেজা দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন তখন বলবো "আমরা তো তোমাদেরই ভাই। তোমরা যেখানে যাচ্ছ আমাদেরও সেখানেই নিয়ে চল। এর চেয়ে বড় কিইবা প্রার্থনা আমাদের থাকতে পারে।

শহীদ হালিম-রহমত-বিমান আমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাদের পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আর কোন পথে নয়। আর সে জন্যই আজ সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। বাতিলের সুরম্য প্রাসাদে বজ্রের কাঠিন্য এবং উল্কার ক্ষিপ্রতা নিয়ে আঘাত হানতে হবে। সে কঠিন সংগ্রামেই ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে হবে আজই। তাহলেই সার্থক হবে শহীদদের শাহাদাৎ বার্ষকী পালন।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই স্মরণিকা প্রকাশিত হলো তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ। রব্বুল আ'লামীন আমাদের শহীদদের কবুল করুন। আমিন।

শেখ আঃ ওয়াদুদ
সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
খুলনা মহানগরী শাখা

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শহীদ হালিম রহমত বিমান আমান স্মরণে

জনসভা

ডাক বাংলা চত্তর, ২০ সেপ্টেম্বর '৯৪

বিকালঃ ৩ টা

প্রধান অতিথি ঃ

❒ মুঃ রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় সভাপতি

বিশেষ অতিথি ঃ

❒ অধ্যক্ষ মুঃ আবু তাহের, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

❒ সাইফুল আলম খান মিলন, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

❒ মুঃ তাসনীম আলম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

❒ ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুঃ তাহের
IIFSO সেক্রেটারী জেনারেল, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

❒ শেখ কামরুল আলম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

সভাপতি ঃ

❒ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মহানগরী সভাপতি

দলে দলে যোগ দিন

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

খুলনা মহানগরী

www.pathagar.com

আমাদের কথা

এক এক জন শহীদ একটি সমাজে ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনাকে যত খানি উজ্জ্বল করে তুলতে পারে পৃথিবীর আর কোন শক্তিই বোধ হয় তা পারে না। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে অগন্য মর্দে মুজাহিদ শাহাদাৎ বরণ করেছেন। তাদের কাতারে খুলনার শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী, আমানুল্লাহ আমান, আমিনুল ইসলাম বিমান এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। যাদের প্রত্যেকটির দীপ্তি প্রত্যেকটি অপেক্ষা উজ্জলতর। তাঁদের শাহাদাৎ খান জাহান আলীর (র) খুলনায় ইসলামী বিপ্লবের গতিকে বহুগুন ত্বরান্বীত করেছে। লাখো তরুণের অনুপ্রেরনার অনন্য সাধারণ প্রশ্রবন আজ হালিম রহমত আমান-বিমান।

শহীদরাই আমাদের সবচেয়ে সেরা সম্পদ। একারণেই তাদের ত্যাগ কোরবানী এবং জীবন যাত্রার ধরন সম্পর্কে সকলেরই সহজাত অনুসন্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক। একটি স্মরণিকা এ অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করতে সক্ষম। এলক্ষ্যেই খুলনার শহীদদের স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিকূলতার পর্বত প্রমাণ বাঁধা আমাদের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বার বার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত সকল কিছু ছাপিয়ে জয়লাভ করে। আর্থিক দৈন্যের কারণে যেমনটি আশা করা হয়েছিল তেমনটি না পারলেও আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি একটি ভালমানের স্মরণিকা প্রকাশের। অনেক লেখা থেকে মাত্র গুটি কতক লেখা ছাপার সুযোগ হয়েছে কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে। যারা লেখা দিয়েছেন তারা শহীদের অনুভূতি এবং স্বপ্নের সাথে একাত্ম হয়েই লেখা দিয়েছেন একারণে সকলের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদেরকেও আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের শহীদ ভাইদের শাহাদাৎকে কবুল করুন। কবুল করুন শহীদদের স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেও। আমিন।

www.pathagar.com

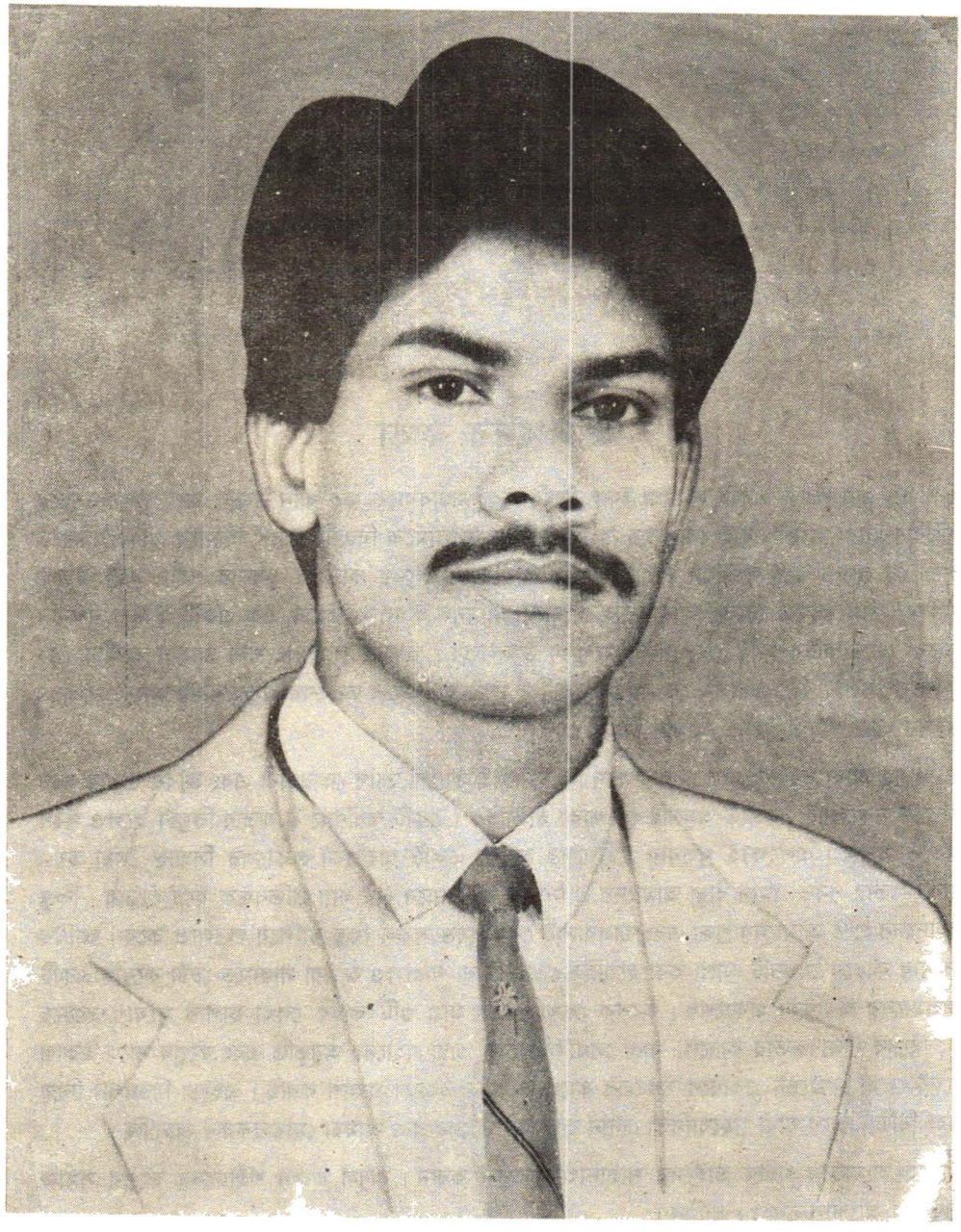

শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

পিতাঃ মুন্সী মোহাম্মদ, মাতাঃ শরীফা খাতুন। জন্মঃ ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭০। ভাইবোনঃ ৬ ভাই, ৫ বোন।
ঠিকানাঃ গ্রামঃ মশিয়ালী, ডাকঘরঃ দামোদর, থানাঃ খানজাহান আলী, জেলাঃ খুলনা।

শিক্ষা জীবনঃ প্রাথমিক শিক্ষাঃ মশিয়ালী পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক শিক্ষাঃ দামোদর এম এম উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে এসএসসি,১৯৮৭ সালে দৌলতপুর কলেজ থেকে এইচএসসি এবংশাহাদাতকালে বিএল কলেজে বিকম (অনার্স) হিসাবজ্ঞান ২য়বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনঃ তিনি ১৯৮৭ সালের ৫ই অক্টোবর কর্মী, ১৯৮৯ সালের ১৮ই আগস্ট সাথী এবং ১৯৯১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সংগঠনের সদস্য হন শাহাদাতকালীন সময়ে তিনি খুলনা মহানগরী শাখা শিবিরের সদস্য সরকারী বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সভাপতি ও বিএল কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জিএস ছিলেন।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ রহমত আলী

পিতাঃ মরহুম শেখ মোফাজ্জেল হোসেন। মাতাঃ রফিয়া বেগম। জন্মঃ ১৯৬৮ সাল। ভাই বোনঃ ৫ ভাই ৩ বোন শহীদ রহমত আলী ভাইদের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন। ঠিকানাঃ গ্রামঃ দোহার, থানাঃ তালা, জেলাঃ সাতক্ষীরা।

শিক্ষা জীবনঃ গ্রামের স্কুল থেকে এস এস সি পাশ করে ১৯৮৪ সালে বি এল কলেজে ভর্তি হন। '৮৬সালে এইচ এস সি পাশ করেন এবং একই বছর তিনি বি এল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সাথে অনার্স পাশ করে বি এল কলেজেই এম, এস, এস শেষ ভাগ রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনঃ ১৯৮৮ সালে সংগঠনের সাথী এবং ১৯৯৩ সালে সদস্য প্রার্থী হন। শাহাদাতের সময় তিনি বি এল কলেজ ক্যাম্পাস শাখার সেক্রেটারী ছিলেন।তখন তিনি বি এল কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদকও ছিলেন ।

www.pathagar.com

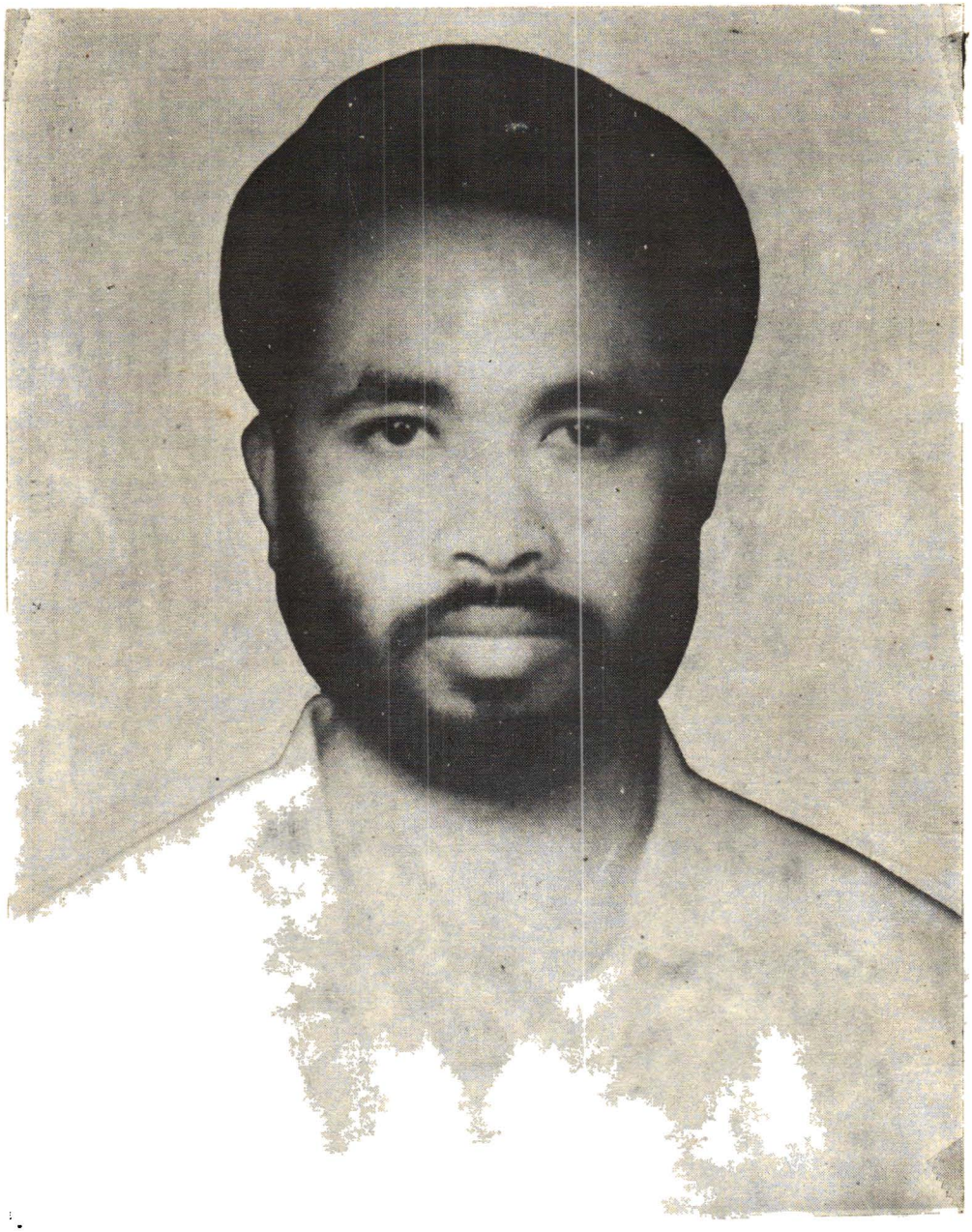

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান

পিতাঃ শেখ মুহাম্মদ ইদ্রিস মাতাঃ মরহুমা মোসাঃ জাহানারা বেগম। ভাইবোনঃ ভাই- ৩ জন বোন- ২ জন। জন্মঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ইং, জন্ম স্থানঃ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পিতার কর্মস্থলে।

ঠিকানাঃ গ্রামঃ টুঙ্গীপাড়া, জেলাঃ গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ ছোট বয়রা, ডাকঘরঃ জি,পি,ও, খুলনা।

শিক্ষা জীবনঃ প্রাথমিকঃ নূরনগর ওয়াপদা শিশু শিক্ষা নিকেতন থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মাধ্যমিকঃ নূরনগর ওয়াপদা মাধ্যমিক শিক্ষা নিকেতন থেকে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন। উচ্চ মাধ্যমিকঃ খুলনা হাজী মহসিন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। স্নাতকঃ তিনি দৌলতপুর দিবা নৈশ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি বি এল কলেজে এম এ বাংলার ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনঃ শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ১৯৭৯ সালে সংগঠনে যোগদান করেন। শাহাদাৎ বরণের সময় তিনি সংগঠনের সাথী হিসেবে বিএল কলেজ ক্যাম্পাস শাখার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.pathagar.com

শহীদ আমানুল্লাহ আমান

পিতাঃ (মৃত) শেখ শহীদুল্লাহ। মাতাঃ মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন। জন্মঃ ১৯৭৯ সাল। ভাইবোনঃ ৪ বোন, ২ ভাই।
বর্তমান ঠিকানাঃ খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা হোস্টেল (এতিমখানা)। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ দরগাহপুর, ডাকঘরঃ দরগাহপুর, থানাঃ আশাশুনি, জিলাঃ সাতক্ষীরা। পারিবারিক অবস্থাঃ পিতৃহীন পরিবারের আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় পরিবার পরিচালিত হয়ে থাকে।
শিক্ষা জীবনঃ শাহাদাতের সময়ে তিনি ছিলেন খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্র।
সাংগঠনিক জীবনঃ তিনি শিবিরের কর্মী ছিলেন।

www.pathagar.com

শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থ ঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ শাহিদ" মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাতাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে ইসলামকে সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লিখিত দু'ধরনের অর্থ বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছে ঃ 'ওয়া কা ফা বিল্লাহি শাহিদা' অর্থাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য হিসাবে আল্লহই যথেষ্ট।

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

"যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারে এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার।" (সূরা হজ্জ-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৪০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছেঃ "ওয়ালা ইয়ালামাল লাহুল্লাজিনা আমানু ওয়াইয়াত্তাখিজু মিনকুম শুহাদা'। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান।" সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশী আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে "ওয়াকতুলুনা ফাইয়াকতুলুন" "যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গাতে শহীদদের কথা বলা হয়েছে।

"ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহযানু ওয়ানতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতুম মু'মিনীন। ইন ইয়ামছাছকুম কারহুন ফাকাদ মাচ্ছাল কাওমা কারহুন মিছলুহু।"

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন। কেন জয় পরাজয় দেয়া হয়, এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

"আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে, আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে।"

এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষ্য দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষ্য। আল্লাহর পথে নিহত যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্যঃ

মুমিন জীবনের কাম্য কি হতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়ীতে ভোগ করে তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন 'এমনভাবে আমল কারো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো। হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া

www.pathagar.com

যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আর মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ের জন্য। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখা-পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলাধুলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাতে কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহলে শাহাদাত তার জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একামাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসীর হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মউতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এসময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও? এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নজীর সৃষ্টি করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন এত এটিই প্রমাণিত হলো ইসলামের প্রতি তাঁর আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এযুগেও তা বাস্তব। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যাঁরা মানুষকে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রামঃ

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভাল ছাত্র যেমন ভাল ফলাফলের প্রমান দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে প্রমান পেতে পারে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকান্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তাঁর মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরনা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যাঁরা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয়, তাঁকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (সূরা নেসা-৭৪)

বস্তুতঃ যাঁরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তাঁরাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পরে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়, যুদ্ধে যারা মাঁরা ও মরা অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাত বরন করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহর বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না যাঁরা কাফের বেঈমান তারাও কেতাল করে। মুমিনরা কেতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কেতাল করে তাগুতের পথে।

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানীরও সীমা লংঘনকারী। তাগুত নিজেতো আল্লাহর হুকুম পালন করে না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে বলে অপরাধী আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাহলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিসকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কলেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এর পরই আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা না থাকলে সে

www.pathagar.com

পূর্নভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারবে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছাসমূহ উত্তমরূপে পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে ফসল পাবার আশা অর্থহীন। অনুরূপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কি তা না জানলে উৎপাটন করবে কি করে? বস্তুতঃ তাগুত ও ঈমান এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না হয় তাগুতের পথে। কেননা, আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, খেলাফাতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মার্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিসের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ কেতাল করছে হয় কি সাবিলিল্লাহ না হয় ফী সাবিলিত তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

শহীদের কামনাঃ

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ যাঁরা জীবন দান করে তাঁদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ আয়াতে বলা হচ্ছে-

"আর যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত, কিন্তু তাঁদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।" সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াতে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাঁদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ তাঁদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তাঁরা খুশী ও পরিতৃপ্ত এবং যে সব ঈমানদার লোক তাঁদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।"

উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁরা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এপথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। হাদীস শরীফে আছে যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তাঁরা কামনা করে যে, তাঁদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায়। এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশী হবে। অপর এক হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সঃ) বলেন 'জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নিয়ামতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নিয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম।' বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন 'জান্নাতে যাঁরা যাবে তাঁদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক কিন্তু শহীদগণ কামনা করবেন যে আল্লাহ দুনিয়ায় তাঁদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তাঁরা করবে।

শাহাদাতের মর্যাদাঃ

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কুরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

সূরায়ে আল হজ্ব এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে; "যাঁরা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিয্ক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।

সূরায়ে মুহাম্মদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে;

"অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হল গলা কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালভাবে তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে। এই-ই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন কিন্তু তিনি এ পন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।" তিনি তাঁদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তাদেরকে সে জান্নাতে দাখিল করবেন যার বিষয়ে তিনি তাঁদেরকে অবহিত করিয়াছেন।

এখানে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে-

১। আল্লাহর পথে যাঁরা নিহত হয়েছে তাঁদের আমল কোন ক্রমেই নষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাঁদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার নেই।

www.pathagar.com

৩। তাঁদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাঁদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাঁর পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করান হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হচ্ছে– নবী করীম (সঃ) বলেন 'জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়া তলে।

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে আসলো না তাঁর আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলা হচ্ছে জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে।

শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদীস উল্লেখ না করলে উপরের কথাগুলো পরিষ্কার হয় না। শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখপূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

১। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ) তিনি বলেছেন আমি নবী করীম (সঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা, রাতে চলে যেতাম। একরাত্রি আমি রসূল (সঃ) এর খেদমতে রয়ে গেলাম। আমি শুনলাম যে রসূল (সঃ) কেবল ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ, পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হত। একদিন রসূল (সঃ) বললেন হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দেব। আমি বললাম দুনিয়াটা তো নষ্ট হয়ে যাবে, এটি চেয়ে কি লাভ। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে, আমি কি চাইব। আমি ভাবলাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রসূল (সঃ) বললেন– এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন কে তোমাকে এ কথাটি শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সংগে সংগে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এজন্য এ দোয়া করবেন। রসূল (সঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এ দোয়া করবো। আমাকে তুমি সাহায্য কর বেশী বেশী সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশী বেশী সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।

আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদিন আমি রসূল (সঃ) এর কাছে বললাম ইয়া–রাসূলাল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমল করলে আমি বেহেশতে যাব। মানে বেহেশতই তাদের ধান্ধা, দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

২। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিনে যখন আবদুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রসূল (সঃ) বললেন হে জাবির, তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন তাকি তোমাকে আমি বলবো? আল্লাহ তায়ালা কারো সংগে সরাসরি কথা বলেন না কিন্তু তোমার বাবার সগে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন হে আবদুল্লাহ তুমি আমার কাছে কি চাও। তিনি বললেন হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন হে আল্লাহ তাহলে অন্ততঃ এটা কর, আমি এই যে আকাঙ্খাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভাইয়েরা আছে তাদের কাছে পৌছে দাও। এরপর এ আয়াত নাজেল করে আল্লাহ এ কথাটা পৌছে দিলেন্সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াত এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

৩। আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নাজার বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রসূলকে (সঃ) বললেন হে আল্লাহর রসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পয়লা যে যুদ্ধ করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবে আমি কি করি। যখন ওহুদের দিন আসলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন– হে আল্লাহ! আমার ভাইয়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর মুশরিকরা যে আমাদের সাথে এ আচরণ করলো, এ ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রাঃ) এর সাথে তার দেখা হলো। বললেন হে মায়াজ! জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কছম করে বলছি আমি ওহুদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি।

অতঃপর সাদ বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন আমার চাচার গায়ে আমি আশিটি জখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের, বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি, একমাত্র তার বোন তার আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন– আমরা সকলেই ধারণা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে (সূরায়ে আহযাবের ২৩ নং আয়াত)

"মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের আচরণ বদলায়নি।

৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত কতক লোক রসূলের (সঃ) কাছে এসে বললো হে রাসূল, আমাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য

www.pathagar.com

কিছু লোকদিন। আল্লাহর রসূল আনসারদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোক তাদের সাথে দিয়ে দিলেন, তাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য। তারা সব ক্বারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারাম শরীফ ছিলেন। তারা রাতের বেলা কোরআন শিখাতেন, আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এনে মসজিদে রাখতেন, তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাড়কি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রি করে তা দ্বারা আহলে ছুফ্‌ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। ঐ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেললো, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাদের নবীর কাছে খবরটা তুমি পৌঁছিয়ে দাও, যে আমরা আমাদের রবের সংগে সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশী হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশী হয়ে গেছেন। আমাদের মামা হারামের কাছে একজন লোক আসলো এবং পিছন থেকে বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেল। তিনি বললেন– কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি। অহীর মাধ্যমে এ খবর রসূল (সঃ) জানতে পেরে, লোকদেরকে বললেন– দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করল– "হে আল্লাহ আমাদের নবীকে এ কথা পৌঁছায়ে দিন যে আমরা আমাদের বের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানীতে আমাদের রব খুশী হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশ হয়েছি।

৫। আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশায়ারী (রাঃ) বললেন– তারা দু'জনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন– রসূল বললেন– নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়–চোপড় তেমন ছিল না, বললো হে আবী মুসা রসূল কি বললেন শুনলেন তো। তিনি বললেন হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবো না। তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙ্গে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন।

৬। হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য আরব রসূল (স) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সংগী হয়ে গেল। সে বলল "আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে আপনার সাথে মদীনায়ই থাকব।"

এ লোক সম্পর্কে রসূল (সঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়াত দিলেন। যখনি জিহাদ হতো তাতে যে গনীমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকের জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক আসলে তাকে তা দেয়া হয়। ঐ লোক উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদদের উট চড়াবার জন্য গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলে সে বলল, 'এটা কী? লোকেরা বলল যে রসূল (সঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রসূল (সঃ) এর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে এসব কী? রাসূল (সঃ) বললেন যে এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এ মারের জন্য আপনার সংগী হইনি। আমি তো এ জন্য আপনার অনুগত হয়েছি যে আমার গলায় দুশমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসূল (সঃ) বললেন, যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে এরূপই করবেন।

কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরীক হলো। যখন তার লাশ রাসূল (সঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই লোক যে শাহাদাত কামনা করেছিল? সবাই বলল হ্যাঁ। রাসূল (সঃ) বললেন, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ তা পূরণ করলেন।

তারপর রাসূল (সঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ এ লোক আপনার বান্দাহ যে আপনার পথে হিজরত করেছে এবং আপনার পথেই সে শাহাদাত পেল। এ বিষয় আমিই তার সাক্ষী।"

এ সব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল।

আল্লাহ পাক কার মওত কিভাবে কোথায় দেবেন একথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রসূল (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙ্খা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসীব হয়। আল্লাহ পাক আমাদের এ আকাঙ্খা কবুর করুন। আমীন!

www.pathagar.com

শহীদি জনপদে স্মৃতিময় ক'টি দিন

মুহাম্মদ হামিদ হোসাইন আজাদ

গত কয়দিন ধরে তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লম্ফঝম্ফ আর কতিপয় সন্ত্রাসবাদী সেবাদাস পত্রিকার কাগুজে সন্ত্রাস সারাদেশে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্ম দিয়েছে। ধর-মার-খতম কর ইত্যাদিই ঘাতক দলের নিত্য চিন্তা আর ভাষায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিটি বিবেকবান মানুষ উদ্বিগ্ন অথচ সরকার রহস্যজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ যা কখনো একটি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট আশা করা যায় না। ফলে সচেতন বিবেকমাত্রই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। দিন যতই যাচ্ছে নৈরাজ্য বাড়ছে- বাড়ছে অস্থিরতাও। ২৫শে মার্চ '৯২ রাত সাড়ে এগারটা। এক অজানা আশংকায় মনটা হঠাৎ যেন পেরেশান হয়ে উঠল। মুহূর্তেই স্মরণ হলো রাত সাড়ে সাতটায় খুলনায় টেলিফোন করার সময় ইলিয়াস ভাই কথা শুরু করতে না করতেই বলছিলেন- "হামিদ ভাই, এখন রাখি পরে রিং করবো। তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সশস্ত্র মিছিল আমাদের অফিসের দিকে।" এ কথা স্মরণ হতেই মনটা আনচান করে উঠল। সাথে সাথেই খুলনা মহানগরী শিবির অফিসে টেলিফোন করলাম। ওপ্রান্ত থেকে ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাই জানালেন ইফতারের পর সভাপতিসহ আমরা কয়েকজন ভাই অফিসে নিত্যদিনের মত অবস্থান করছিলাম। রাত সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ করেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি সশস্ত্র মিছিল আমাদের অফিসে হামলা করে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের উপর পরিচালিত এ পৈশাচিক হামলায় বেশ কয়েকজন ভাই আহত হন। ৪ জনের অবস্থা গুরুতর। তার মধ্যে আমিনুল ইসলাম বিমান ভাইয়ের অবস্থা আশংকাজনক। ডাক্তার বলেছেন, ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার আগে তাঁর ব্যাপারে কিছুই বলা যাবে না।"

এ দুঃসংবাদ শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে টেলিফোন রাখলাম। কিছু ভাবার আগেই ২ মিনিটের মধ্যে আবার রিং বেজে উঠল। টেলিফোন তুলতেই ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাইয়ের কান্নাভেজা কণ্ঠ ভেসে আসল "হামিদ ভাই, এইমাত্র হাসপাতাল থেকে বেলাল ভাই টেলিফোনে জানালেন, আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আমরা এখন কি করব"- তখন রাত ১২টা ১০ মিনিট।

আলাপ শেষে সাথে সাথে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে জানানো হলো, পরক্ষণেই উপস্থিত পরিষদ সদস্য ভাইদের বৈঠকে শাহাদাত পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পরদিন ২৬-৩-৯২ ফাস্ট ফ্লাইটে আমি এবং কামরুল ভাই খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

শোকাহত খুলনা

খুলনা পৌঁছে দেখি সমগ্র শহর নীরব নিস্তব্ধ। দিনটি স্বাধীনতা দিবস হলেও এখন শহরে কোথাও কোন আনন্দের রোল নেই, আওয়াজ নেই- শিশুপার্ক পার হয়ে জামায়াত অফিসের সামনে দেখলাম অসংখ্য শিবির কর্মী এবং নেতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, অনেকে অধিক শোকে পাথর হয়ে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় সন্তানহারা মাকেও এরূপ ভেঙে পড়তে দেখিনি। ভেতরে ঢুকে দেখি নেতৃবৃন্দ বসে আছেন- সকলের চোখে মুখে বেদনার ছাপ। সমগ্র পরিবেশটাই এক অভাবিতপূর্ব করুণ দৃশ্যে ভরা। নেতৃবৃন্দের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার পথে অনেকগুলো রাস্তা অলিগলি অতিক্রম করলাম। বহু মানুষের সাথে দেখা হলো। কারো মুখে হাসি দেখলাম না। কোথাও আনন্দের সামান্যটুকু রেশ নেই। চারদিকে শোকের ছায়া, মনে হলো আমিনুল ইসলাম বিমানকে হারিয়ে সমগ্র খুলনাই শোকাহত। আমিনুল ইসলাম বিমান যেন খুলনার প্রাণ ছিল। তাঁর বিদায়ে আজ সমগ্র খুলনা যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। কলরবে মুখরিত প্রাণবন্ত খুলনা আজ স্বাধীনতা দিবসেও নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। যেটুকু আওয়াজ কানে আসে, হয় কুরআন তেলাওয়াতের নতুবা কান্নার।

লাশের মিছিলে আমাকে খুঁজবেন

জোহর নামায শেষে শহীদের বাড়ীতে গেলাম। ইতিমধ্যে লাশের গোসল সম্পন্ন করে নামাযে জানাযার জন্যে কফিন Ready করা হয়েছে। আমরা যখন বাড়ী পৌঁছি তখন কফিন বাসা থেকে বের করে মাঠে আনা হয়েছে। কফিন ঘিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন শহীদের আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরা। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ওখান থেকে আসলাম ওয়াপদা কলোনীতে। এ কলোনীতেই শহীদ বিমান বড় হয়েছে। তাঁর আব্বা ওয়াপদার চাকুরে হিসেবে নিজস্ব বাসায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ কিছুদিন পর্বেও তাঁদের বাসা ছিল ওয়াপদা কলোনীতে। কফিন কলোনী মাঠে পৌঁছার পূর্বেই আমরা কলোনী মাঠে এসে পৌঁছলাম। গাড়ী থেকে নামতেই উৎসুক জনতা এবং শহীদের ভাইয়েরা আমাদের ঘিরে জড়ো হয়ে গেলো। এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শহীদের জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। আলাপচারীতায় এক ভাই জানালেন- "কাল এ সময়ে (২৫ তারিখ বাদ যোহর) বিমান ভাই এ গাছের নীচে দাঁড়িয়েই আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ সুলতান ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন- "আপনারা আমাকে

www.pathagar.com

খুঁজবেন না। আমার লাশ নিয়ে যখন মিছিল হবে ঐ মিছিলেই আমাকে খুঁজবেন। আর আমার লাশটি একটু ওয়াপদা কলোনীতে ঘুরিয়ে নেবেন।"

ভাইদের এ কথা বলেই তিনি শিবির অফিসে গিয়েছেন এবং এ যাওয়াই শেষ যাওয়া। সেদিন সন্ধ্যায়ই ঘাতকদের হামলায় আহত হয়ে বিমান ভাই শাহাদাত বরণ করেন। বিমান ভাই আর ওয়াপদা কলোনীতে ফিরে আসেননি। এসেছে অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর লাশ। কথাগুলো বলতে বলতে সব বন্ধু-বান্ধবরাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতিমধ্যে শহীদের কফিনবাহী ট্রাক ওয়াপদা কলোনী মাঠে এসে পৌছালে কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে উপস্থিত সকলেই শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে।

অতঃপর প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। জানাযার পূর্বে শাহাদাতের মর্যাদা ও শহীদের উত্তরসূরীদের করণীয় সম্পর্কে যখন বক্তব্য রাখছিলাম তখন অশ্রুসজল প্রতিটি মানুষ যেন নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এ প্রত্যয় ঘোষণা করলেন- শহীদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে আমরা বদ্ধপরিকর।

বিকেল ৪টায় শিশুপার্কে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, নামাযে জানাযার পূর্বে অনুষ্ঠিত এ বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ মুহূর্তেই জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। হাজার হাজার ছাত্র-জনতার গগণবিদারী শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। শুধু প্রতিবাদ নয়- ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত এ সমাবেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা উচ্চতিক হয়- "শহীদ শেখ আমিনুল ইসলামের শাহাদাতের মাধ্যমে খুলনার মাটি থেকে ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হলো- আর ইসলামের বিজয় হলো সুনিশ্চিত।" নামাযে জানাযা শেষে হাজার হাজার তৌহিদী জনতা কফিন নিয়ে কালেমা শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে কবর পানে ।স্রোতস্বীনি নদীর বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত যেমন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যায় সাগর অভিমুখে এ মিছিল দেখেও মনে হচ্ছিল এক অপ্রতিরোধ্য জনস্রোত এগিয়ে চলেছে কোন এক মহা আকর্ষণে- সামনের দিকে। নদীর কল কল রবের মত হাজার কণ্ঠে কালেমা শাহাদাতের বাণী এক অপূর্ব মধুর পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে।

কি অপরাধ আমার ভাইয়ের

২৭শে মার্চ, ৯২ ছিল দোয়া ও শোক দিবস। এদিন ৭৫ থেকে ৮০ খতম খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয় খুলনা শহরে। শুধু ওয়াপদা মসজিদে (যেখানে বিমান ভাই প্রায়ই নামায পড়তেন) ৫ বার খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সকাল বেলা গিয়েছিলাম শহীদের পরিবারবর্গের সাথে দেখা করতে। বাসায় ঢুকতেই এগিয়ে আসলেন শহীদের বড় বোন নাসিমা খানম দিলু। এখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। সামনে এগিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভাই বিমান কই? ওর কি অপরাধ ছিল? ওকে কেন হত্যা করা হলো?" টপ টপ কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন ছাড়া আমরা আর কোন জবাব দিতে পারিনি। অতঃপর তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছে হয় ঘাতকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে- আমার ভাইয়ের কি অপরাধ ছিল? কি অপরাধে তারা বিমানকে হত্যা করেছে? জানি ওরা কোন জবাব দিতে পারবে না।" বিমানের অপরাধ ছিল একটাই- ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতো না, ওদের সন্ত্রাস ও চুরি-ডাকাতিকে ঘৃণা করতো।" বিস্ফারিত নেত্রে আবার জিজ্ঞাসা করলো "আপনারা কি বিমানের মত আমাকে দেখতে আমার বাসায় যাবেন?"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবেগাপ্লুত হয়ে বড় বোন আবার মুখ খুললেন, "আমি কখনও জামায়াত-শিবিরকে পছন্দ করতাম না, ঘৃণা করতাম। আমার ভাই কেন শিবির করতে পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল আমি বুঝতাম না। এখন আমি বুঝেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি এখন বিএল কলেজে ভর্তি হবো-সক্রীয়ভাবে রাজনীতি করবো, বিমান যে আদর্শের জন্যে জীবন দিয়েছে আমি সে আদর্শের বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌছাবো। প্রয়োজনে সে আদর্শের জন্যে আমিও জীবন দেবো।" অতঃপর আবার তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এদিকে ঘরের ভেতর শহীদের মা (আপন মা জীবিত নেই) বিমান- বলে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

উল্লেখ্য শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান ভাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বংশোদ্ভুত। এদিক থেকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ট আত্মীয়া। পারিবারিক সূত্রে আব্বা-আম্মাসহ সকলেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সক্রীয়ভাবে জড়িত। শুধুমাত্র বিমান ভাই ছিলেন ব্যতিক্রম। এ কারণে ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে পারিবারিকভাবে তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার পিতার কথায় পরে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিমান ছিল অতুলনীয়

সেদিন শহীদ-এর বাড়ী থেকে বেরিয়েই জানতে পারলাম শহীদ বিমান ভাইয়ের দুই ঘনিষ্ট বন্ধু মোশতাক ভাই এবং রাশেদ ভাই শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। তাদের একটু শান্ত্বনা দেয়া দরকার। তাই তাদের সাথে দেখা করার জন্যে এবং ওয়াপদা কলোনী জামে মসজিদে জুমার নামায শেষে দোয়ার মাহফিলে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াপদা কলোনীতে গেলাম। মোশতাক ভাইয়ের সাথে আলাপ শেষে মসজিদে গেলাম। দেখলাম সমগ্র মসজিদে শোকের ছায়া। ঈমাম সাহেব খোতবার আগে অশ্রুসজল নয়নে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন- "আজ আমাদের মাঝে আমাদের একজন নিয়মিত মুসল্লি নেই। গত শুক্রবারেও বিমান এ মসজিদে ঐ উত্তর-পূর্ব কোণায় বসে নামায আদায় করছিলেন। সাধারণের মাঝে বিমান ছিলো এক অসাধারণ ছেলে। তিনি নামায পড়তেন ধীরস্থিরভাবে। আমরা অনেকে লম্বা

www.pathagar.com

জুব্বা পরি, তিনি হয়তো জুব্বা আলখেল্লা পরতেন না, কিন্তু তার কাপড় চোপড় ছিল মার্জিত এবং পরিমিত, নামাযে বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হতো। ভদ্রতায় নম্রতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তাঁর হাসি কান্না সবই ছিল পরিমিত। কখনো উচ্চস্বরে বা চেচিয়ে কথা বলতে তাকে দেখিনি। তার চারিত্রিক মাধুর্য সকলের মন জয় করতো। তাই কলোনীর সকলেই তাকে ভালবাসতো। একথাগুলো বলেই তিনি সকলকে নামায শেষে দোয়ার মাহফিলে শরীক হতে আহবান জানালেন। ঈমাম সাহেব যখন একথাগুলো বলছিলেন তখন মসজিদের উপস্থিত সকল মুসল্লিই কাঁদছিলেন। এ করুণ দৃশ্য স্পষ্টতই প্রমাণ করলো শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমানের স্থান ছিলো সকল মানুষের অন্তরে। নামায শেষে প্রায় সকল মুসল্লিই বসে পড়লেন দোয়ার জন্যে। ইতিমধ্যে উপস্থিত প্রায় সকলেই আমাদের দেখেছেন। উৎসুখ দৃষ্টিতে প্রায় সকলেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। এক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ঐ কলোনীর সম্মানিত একজন অফিসার আমাকে বলেই বসলেন "আপনাকে একটু বক্তব্য রাখতে হবে।"

আমি বিনয়ের সহিত বললাম, "দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখার দরকার নেই। তাছাড়া গতকাল এখানে আমি বক্তব্য রেখেছি এবং মানসিকভাবে এখন আমি প্রস্তুতও না।" কিন্তু না, তিনি নাছোড়বান্দা। সাথে আরো কয়েকজন আর একযোগে বললেন, "আমরা আজ আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।" ইতিমধ্যে ঈমাম সাহেবকে আমাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব ডেকে তার পাশে বসতে বাধ্য করলেন। তিনি দাঁড়িয়েই শহীদ বিমান ভাইয়ের জীবনের ২/১টি তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরে হঠাৎ করে বক্তব্য রাখার জন্যে আমার নাম ঘোষণা করলেন, বাধ্য হয়েই বক্তব্য রাখতে হলো।

আমি যখন শাহাদাত ও মু'মিন জীবনের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলাম তখন আবার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ দৃশ্য ভালবাসার, এ দৃশ্য ভ্রাতৃত্বের, এ দৃশ্য দৃঢ়তার, এ দৃশ্য ছিল গভীর আন্তরিকতার। একজন প্রতিবেশীর প্রতি এমন গভীর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ আমি আর কখনো দেখিনি। সবাই মুহূর্তেই শোককে শক্তিতে পরিণত করলেন। বক্তব্য শেষে শহীদি কাফেলার দায়িত্বশীল হিসেবে সকলের একান্ত অনুরোধের কারণে আমাকেই মুনাজাত পরিচালনা করতে হলো।

নামায শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে মাঠের কোণায় আসতেই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দসহ উপস্থিত সকলেই আমাদের ঘিরে ধরলেন। তথাকথিত ঘাতক দালাল কমিটির জাহানারা ইমাম ও তাদের সৃষ্ট নৈরাজ্যকে সকলেই ঘৃণা করে আলাপ করছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে এক অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার ছিলো এ নৈরাজ্যের? কি দরকার ছিলো এভাবে একটি ভাল ছেলেকে হত্যা করার? আপনারা দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহর তরফ থেকে জাহানারা ইমামের বিচার হবে।"

ইতিমধ্যে নূরু ভাই (কলোনীর একজন দারোয়ান) এসে বেলাল ভাইকে জড়িয়ে ধরে আর্তচিৎকারে ভেঙ্গে পড়লো 'বিমান ভাই কই' এ কথা বলেই তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘক্ষণ তাকে হুশ করা গেলো না। বুঝলাম সত্যিই সর্বস্তরের মানুষের সাথে বিমান ভাইয়ের ছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। ওখানে আলাপ প্রসঙ্গে জানলাম, শিবির করার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিমান ভাই বাড়ী থেকে টাকা পেতেন না। তাই তিনি ছ'টা টিউশনি করতেন।

এর মধ্যে একটা চিটউশনির টাকা নিজে খরচ করতেন- আরেকটা ডিশনির টাকা দিয়ে আরেকজন দরিদ্র কর্মী ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ বহন করতেন। আহত হয়ে বা অসুস্থ হয়ে তার পরিচিত যে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন- খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ছুটে গিয়েছেন আর রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আরও জানলাম, কেউ তার সামনে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন সমস্যার কথা বললে সাথে সাথে সে সমস্যা সমাধানের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। সেদিন বিকেল ৪টায় ছিল শোক মিছিল। হাজার হাজার ছাত্র জনতা শোক মিছিলে যোগ দিয়ে কালেমা শাহাদাতের বলিষ্ঠ আওয়াজে সমগ্র শহর প্রকম্পিত করে তোলে। শহীদের সাথীদের এ সুশৃঙ্খল অথচ দীর্ঘ এ মিছিল প্রমাণ করেছে আমরা শোকাহত নই- শহীদি প্রেরণায় উজ্জীবিত।

শোক মিছিল পরদিন ২৮শে মার্চ-এর হরতালের সমর্থনে এক খন্ড মিছিল বের হলে পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ঐ মিছিলের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এমনকি তারা ইফতারের সময় জামায়াত অফিসে পর্যন্ত হামলা চালায়। গ্রেফতার করে ৩জন জামায়াত ও শিবির কর্মীকে। কিন্তু এসব নির্যাতন আর জুলুম শহীদের ভাইদের দমাতে পারেনি। সকল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে রাত দশটায় শিবির কর্মীরা হরতালের সমর্থনে অসংখ্য মিছিল করে রাজপথকে প্রকম্পিত করে তোলে।

হরতাল ও পেশাজীবিদের বক্তব্য ঃ

২৮ মার্চ '৯২। শিবির নেতা শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান হত্যার প্রতিবাদে খুলনায় সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবির। এ হরতালের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে খুলনার সর্বস্তরের পেশাজীবী শ্রমিক ও বনিক সম্প্রদায়। হরতালের সমর্থন দিতে গিয়ে শ্রমিক নেতা নূরু ভাই বলেন- বিমানকে হত্যা করে হত্যাকারীরা আমাদের ঈমান-আকীদার উপর হামলা করেছে। আমরা এর সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবো। নিউমার্কেট বণিক সমিতির সভাপতি বলেন "আমি অনেক ভাল মানুষ দেখেছি, ভাল-এর Defination ও দেখেছি। ভাল মানুষ এবং ভাল-এর যে Defination আমি দেখেছি তার চেয়ে

www.pathagar.com

অনেক গুণ বেশী ভাল ছিল বিমান। এমন এক অসাধারণ ছেলের হত্যার প্রতিবাদে আমরা হরতাল করবো। কাল ১২টা পর্যন্ত কোন দোকান খুলবে না।

সর্বাত্মক হরতাল পুলিশের পৈশাচিকতাঃ

সকল হুমকী ও প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ঐদিন সেহরী খাওয়ার পর পরই হরতাল সফল করার জন্য রাজপথে নেমে পড়েন। না কোন পিকেটিং এর প্রয়োজন নেই। সকাল দশটা পর্যন্ত খুলনার ইতিহাসে নজীরবিহীন শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। রিকশা, ট্রাক, বাস কিছু চলেনি রাস্তায়। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই ছিল বন্ধ। সকাল দশটর পর থেকে কোন কালো হাতের ইশারায় পুলিশ বর্বর রূপ পরিগ্রহ করে। যেখানেই শিবির বা জামায়াত কর্মী পাচ্ছে অন্যায়ভাবে তাদের মারধর করছে, গ্রেপ্তার করছে, সিভিল পোশাকে পুলিশ রাজপথে রিকশা নিয়ে নামছে আর কেউ বাধা দিলেই তাকে বেধড়ক মারধর এবং গ্রেপ্তার করেছে। অন্যায়ভাবে আমাদের ১৪ জন ভাইকে গ্রেপ্তার করে তাদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। সেদিন পুলিশের নারকীয় বর্বরতা এবং নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক মহড়া স্বৈরাচারী শাসনামলকেও হার মানিয়েছে। এতদসত্ত্বেও হরতাল হয়েছে সফলভাবে।

শহীদ পরিবারে কিছুক্ষণ; নিশ্চয়ই মিছিলে ফেরেশতা ছিলঃ

২৯ তারিখ সকাল বেলা ঢাকা ফিরবো। তাই ২৮ তারিখ রাতে শহীদ পরিবারের সাথে শেষ বারের মত দেখা করতে গেলাম শহীদ বিমান ভাইয়ের বাড়ীতে। শহীদের আব্বা আম্মা ভাই বোন ছাড়াও নানা নানী, মামা মামীসহ অনেক আত্মীয় স্বজনে ভরপুর তার বাড়ী। আমরা যাওয়ার পর সকলে আমাদের ঘিরে বসলেন। আজ পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শহীদের পিতা শেখ ইদ্রীস সাহেব কথা শুরু করলেন- "সেদিন জানাজার পর যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছি তা ভুলার নয়। জানাজায় যা লোক হয়েছে জানাজার পর লাশ নিয়ে কলেমার মিছিল কবরের দিকে গিয়েছে তার লোকসংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশী। আমি কবরগাহে গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি মিছিলের শেষ নেই। অসংখ্য সাদা পোশাকধারী সাদা শশ্রু মন্ডিত মিছিলকারী দেখলাম পেছনে, যাদের হাঁটার ধরন একই রকম। নিশ্চয়ই মিছিলে ফেরেশতা ছিল।"

শহীদের মামা মুক্তিযোদ্ধা ও গোপালগঞ্জ জাসদের সেক্রেটারীও একই কথা বললেন। শহীদের পিতা তার প্রিয় পুত্রের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, "আমার ছেলেকে আমি একদিন বললাম, তুই ছাত্রলীগে চলে আয়। আমি তোকে জেলা সভাপতি বানিয়ে দেব।" তখন ছেলে বলল, "বুঝেছি আপনি আমাকে দিয়ে লাইসেন্স পারমিটের সুবিধা ভোগ করতে চান। আমাকে দিয়ে এটা হবে না। আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্যই কাজ করবো।"

তিনি আরও বলেন, "ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর এক ইঞ্জিনিয়ারের সামনে আমি তাকে বললাম- তুই পলিটেকনিকে ভর্তি হ, তাহলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবি।" জবাবে সে বললো, "পলিটেকনিকে কেন পড়বো, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঘুষ খাওয়ার জন্য?" শিবির করার কারণে আমার ছেলেকে আমি বহুদিন বকুনি দিয়েছি। নীরবে সে আমার বকুনি শুনেছে। কোনদিন সে আমার মুখের উপর কথা বলেনি। আমার সাথে বেয়াদবী করেনি। আমি বহুবার তাকে রাগ করেছি- কোনদিন সে আমার সঙ্গে রাগ করেনি।

শহীদের গর্বিত পিতা আরও বলেন, "গত কিছুদিন আগে আমি যখন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন রাত তিনটার সময় তাকে খুঁজে পাচ্ছি না- আমি হতাশ হয়ে বললাম, ছেলেটি আমাকে দেখবে না। পরে জানলাম আমার চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করতেই সে ছুটে গিয়েছে। আমি যেদিন থেকে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছি সেদিন থেকে আমার ছেলে আমার জন্য রোজা রাখা শুরু করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়ীতে কাউকে জানতে দেয়নি।" একথা বলেই শহীদের পিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন- "জীবিত থাকতে আমি আমার ছেলেকে চিনিনি, শহীদ হওয়ার পরে চিনলাম।" আমরা সকলে তন্ময় হয়ে তাঁর স্মৃতি কথাগুলো শুনছিলাম।

এরপর বিদায় নিতে গেলে আবার সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শহীদের নানা জনাব সরওয়াজাহান মোল্লা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে বুক ভরিয়ে দিলেন। এভাবে কামরুল ভাই আর বেলাল ভাইকেও শহীদের দুলাভাই বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন আমাদের ভুলবেন না।"

সবশেষে গাড়ীতে উঠার প্রাক্কালে শহীদের ছোট ভাই মামুন আমার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বললো- "আমি খুলনার দ্বিতীয় শহীদ হবো।" সত্যিই এ দৃশ্য প্রেরণার উৎস।

শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান খুলনার প্রথম শহীদ। ভদ্র, নম্র, বন্ধুবৎসল সেবক বিমানের শাহাদাত নিঃসন্দেহে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর শাহাদাতে খুলনায় সৃষ্টি হয়েছে বুক ফাঁটা বেদনার এক বিশাল সাগর। কিন্তু এ সাগরে রয়েছে প্রাণের জোয়ার, প্রেরণা আর চেতনার অপ্রতিরোধ্য স্রোত। এ স্রোত ভাসিয়ে নেবে খোদাদ্রোহীতার শেষ চিহ্নটুকুকে- আর বয়ে আনবে শহীদি জযবায় মহিয়ান কোরআনের রাজমুকুট। খুলনার জমিনে ৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থান আমার হৃদয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছে- আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!

www.pathagar.com

সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও ইসলামী ছাত্রশিবির

এ, এইচ, এম হামিদুর রহমান আযাদ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষকে সুন্দর ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি দেয়। শিক্ষা একটি জাতিকে বাঁচার মত বাঁচতে শিখায়। আর তাকে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নেয়। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারে না॥ এ উদ্দেশ্য সাধনে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার নাম শিক্ষাঙ্গন তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতি তার শিক্ষাঙ্গনের কাছে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সুশিক্ষা আশা করে। অর্থাৎ অভিভাবক মহল সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রতিভার উন্মেশ, স্ফুরণ, ক্রমবিকাশ ও মানবীয় ভাবধারার সুষ্ঠুতা বিধানের মাধ্যমে তাদেরকে মনুষত্ব ও মানবিকতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জাতির প্রত্যাশা শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসবে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং তৈরী হয়ে আসবে আগামী দিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সার্থক হয়ে উঠবে 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে' –এ অমরবাণী। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের শিক্ষাঙ্গন জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি এবং পারছে না। ফলে শিক্ষাঙ্গনের কথা আলোচনা করতে গেলেই আতকে ওঠে মানুষের মন। ভেসে আসে অসংখ্য মুন্সী আবদুল হালিমের মায়ের বুক ফাঁটা কান্না। এতিম আমানুল্লাহ–এর বোনের ভাই হারানোর বিলাপ গাঁথা আর্তনাদের হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ধর্ষিতা ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবকের বিষন্নতার চিত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়ের ভর্তিচ্ছু ছাত্র কামরুল ইসলামের গুঙানো কান্নার বিভিষীকাময় ঘটনা। তাই প্রশ্ন ওঠেছে মানুষ গড়া আঙ্গিনা শিক্ষাঙ্গনগুলো কি বসনিয়া–কাশ্মীরের' অনুরুপ একেকটি রনাঙ্গন? অভিভাবকগণ চরম দুশ্চিন্তায় ভোগেন কখন কলিজার টুকরা লাশ হয়ে ঘরে ফেরে। শিক্ষকরা পাঠ দান করতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন গোলাগুলি শুরু হয়। পথ চলতে গিয়ে থমকে দাড়ান কখন আবার ছাত্রদের বেধড়ক আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েন। তাই আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে এর কারণ। বিশ্লেষণ করতে হবে এর পরিণতি। উদ্ভাবন করতে হবে এর প্রতিকার। গতানুগতিক ছাত্র রাজনীতির ধারাকে পাল্টিয়ে এর সামনে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। পেশী নিভর ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তে মেধা নির্ভর এবং আদর্শ ভিত্তিক গঠনমূলক রাজনীতির ধারা প্রবর্তন করতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসঃ অতীত ও বর্তমান রূপ

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস অনেকটা 'ঐতিহ্যের' মত লালিত, পালিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের– যাকে কেন্দ্র করে এদশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলন, সেখানেই প্রথম এদেশের শিক্ষাঙ্গনের সকল প্রকার রাজনৈতিক ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রূপলাভ করে ষাটের দশকে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এন, এস, এফ) এর মাধ্যমে। এর পূর্বে পঞ্চাশের দশকে এ ছাত্র সংগঠন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও স্বৈরাচারী আয়ুব খানের শাসনামলে নবশক্তি নিয়ে প্রকাশ করে। জেনারেল আয়ুবের ক্ষমতার মসনদ ঠিক রাখা এবং ছাত্র আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে, ছাত্রদের মাঝে একটি সন্ত্রাসী, দাঙ্গাবাজ গ্রুপ তৈরীর মাধ্যমে, ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার লক্ষেই মোনায়েম খানের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছিল এ ছাত্র সংগঠন। সরকারের মদদ পুষ্ট হয়ে এ সংগঠনের সন্ত্রাসীরা আয়ুব মোনায়েমের হাতিয়ার হিসেবে রাজনীতি এবং শিক্ষাঙ্গন সমূহে এক অশান্ত ও অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টির উন্মত্ততায় মেতে ওঠে। সেখান থেকেই দেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে সন্ত্রাসের সূচনা হয়। পরবর্তী কালে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা জেনারেল আয়ুবের তুখোড় সমালোচক হলেও ক্ষমতা রক্ষার রাজনীতিতে আয়ুবকে অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। যার প্রমাণ মেলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ একনায়কত্ববাদী মানসিকতা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ময়দান ও শিক্ষাঙ্গন উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ সমীকরণ করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনপদের সর্বত্র অস্ত্র ও সন্ত্রাসের বিষ বাষ্প মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে '৭৫ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টাতে খুণী সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রবাজদের হাতে জন জীবন ছিল জিম্মি, খুনের লাশ এবং খুনী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্মে পূর্ণ ছিল শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষার্থীদের হাতে তখন কলম নয় রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড হাতে তারা এক এক জন সৈনিক। দীর্ঘদিনের প্রবাদ Pen is mighter than swrod. তলোয়ারের চেয়ে কলম বড় বা অসির চেয়ে মসি বড়– যে দার্শনিক তত্ত্ব এ বাক্যে নিহিত রয়েছে তাও বদলে গেল। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসিন হলে সংগঠিত হয় নৃশংস ছাত্র হত্যা। তৎকালীন ছাত্র লীগের অন্তদ্বন্দ্বের ফসল এই নৃশংস ঘটনায় ৭জন তরুণের দেহ ব্রাশ ফায়ারে ঝাঝরা করে দেয়া হয়। সন্ত্রাস তার যাত্রা অব্যাহত রাখে।

১৯৭৫ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও সন্ত্রাস কমেনি। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যেও একটি সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে ওঠে। ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং দলের অভ্যন্তরে গ্রুপ ভিত্তিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগতিায় সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে

www.pathagar.com

আপন গতিতে। ১৯৮২ সালে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক সংলাপের সময় একটি জোটের দেয়া শর্ত হিসেবে সরকার প্রধান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বছর ১১ই মার্চ সংঘঠিত 'শিবির নেতার' হত্যাকান্ডের বিচারে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের ক্ষমা করে দেয়। ফলে তাদের খুণীরা ফ্রি লাইসেন্স পেয়ে যায়। ইসলামের উত্থান তথা শিবিরের অগ্রযাত্রা ঠেকানোর জন্য আওয়ামী বাকশালী, মস্কোপন্থী, পিকিং পন্থীদের সাথে তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস চালায়। তাই দেখা যায় এ সরকারের আমলেই ছাত্রদের হাতে সর্বাধিক পরিমাণ অস্ত্র গিয়েছে, সর্বাধিক ছাত্র হত্যা হয়েছে, সন্ত্রাসজনিত কারণে শিক্ষাঙ্গন সমূহ সর্বাধিক পরিমাণ অনির্ধারিতবাতে বন্ধ থাকে।

'৯০ এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার পতনের পর '৯১-এ একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির দীর্ঘ প্রত্যাশার ফশ্রুতিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের করাল গ্রাস থেকে আমাদের শিক্ষাঙ্গন মুক্তি পায়নি। বরং বর্তমান বিএনপি সরকারের সাড়ে তিন বছরের মাথায় শতাধিক ছাত্র নিহত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার বন্দুক যুদ্ধ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫জন শিক্ষক প্রহার, খুলনা বিএল কলেজের নির্বাচিত জিএস এবং সাহিত্য সম্পাদক দ্বয়কে মসজিদে গুলী করে হত্যা, এতিম কিশোর আমানুল্লাহর জীবন ছিনিয়ে নেয়া, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে একজন ডাক্তারসহ তিন ছাত্রের নৃশংস হত্যাকান্ড সহ শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যকর পরিবেশ স্বৈরাচারের আমল কে হার মানিয়েছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। যে অস্ত্র বিগত সরকার সমূহের আমলে প্রবেশ করেছিল তা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়েও বের হয়নি। বরং সন্ত্রাস ও অস্ত্রের মহড়া বাড়ছেই। উপরন্তু সন্ত্রাসের রূপ, ধরণ, প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। আগে লাঠি, হকিস্টিক, দা, কুড়াল, বল্লম ও ছুরিকাঘাতের ঘটনাই ছিল বেশী। বর্তমানে তার স্থান দখল করেছে রাইফেল, স্টেনগান, কাঁটা বন্দুক ও বোমা। অর্থাৎ সন্ত্রাস দিন দিন আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করছে। ছাত্রদের হাতে এসব অস্ত্র দেখে পুলিশও ভয় পায়। উদ্ধার অভিযানে ব্যর্থ হয়ে পরস্পর বলাবলি করে "ওরা এমন সব অস্ত্র নিয়ে এসেছে যেগুলি আমরাও দেখিনি।" এখন প্রশ্ন কোন অদৃশ্য উৎস থেকে ছাত্ররা এসব অস্ত্র পেল?

সন্ত্রাসের উৎস ও কারণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধিকাংশ ছাত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডের মূলে রয়েছে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্ব কতৃত্ব প্রতিষ্টার স্পৃহা। ফলে অস্ত্রের ভাষা প্রাধান্য লাভ করছে। ক্ষমতায় যাবার সিড়ি হিসেবে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করার রাজনৈতিক দলসমূহের হীন মানসিকতা ও ছাত্রদের অস্ত্র শক্তি ও পেশী মহড়ায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর ফলে ছাত্রদের সুস্থ রাজনীতি চর্চার ধারাকে অনভিপ্রেত অসুস্থ ও উৎশৃঙ্খল ধারার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে ছাত্র সংঘর্ষ এবং হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করণ এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতাই সন্ত্রাস নির্ভর ব্যক্তি সমষ্টিকে দিন দিন আরো উৎশৃঙ্খল ও বেপরোয়া করে তুলছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও হয় সে কমিটির রিপোর্ট দিনের আলো দেখেনি, নতুবা শুপারিশ মতো দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং সন্ত্রাস ও তার লাগাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়া শিক্ষক ধর্মঘট, শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপ সমূহের কার্যাবলী, নোংরা শিক্ষক রাজনীতি, অনির্ধারিত ছুটি, সেশনজট, ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রভৃতিও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখতে অনুকূল প্রভাব রাখছে।

প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে হয় আরো দু'টো কারণ আমাদের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে সন্ত্রাসকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর একটি হচ্ছে 'হলুদ সাংবাদিকতা'। একটি পতিত আদর্শের নিকট দায়বদ্ধ এদেশীয় কিছু পত্রিকার সাংবাদিক মহান দায়িত্ব হিসেবে সন্ত্রাসের হোতা এই কারণটির পৃষ্টপোষকতা করে যাচ্ছেন অপর কারণটি হল বৈদেশিক চক্রান্ত। এ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের নষ্ট করে দেয়ার জন্য এরা তৎপর। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ শুধামাত্র সরকারী হিসাব মতেই লক্ষাধিক ছাত্র ভারতে অধ্যয়ন করছে।

প্রতিকার কোন পথে

সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা থেকে এদেশ, এজাতি এবং তার ভবিষ্যৎ অগ্রনায়কদের রক্ষা করতে হলে এখনি তৎপর হতে হবে সকলকে। দেশের সচেতন মহলকে ভাবতে হবে ছাত্র রাজনীতির স্বরূপ নিয়ে। গ্রহণ করতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সংযোগ করতে হবে নতুন মাত্রা। এখানে আমরা কতিপয় নির্দেশনা তুলে ধরছি বিবেচনার জন্য।

প্রথমতঃ ছাত্র রাজনীতিতে মেধার সংযোগ ঘটাতে হবে। মেধাহীন, পেশী নির্ভর ছাত্র রাজনীতি পরিহার করে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র সমাজের মুখপাত্র নির্বাচন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজসহ শিক্ষক ও অভিভাবক মহলকে সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ পরমত সহিষ্ণুতা ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আচরণ বিধি তৈরী করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চার বিধান থাকতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের ক্ষেত্র জাতীয় রাজনীতি থেকে ফিরিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিক্ষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শামিল করতে হবে।

তৃতীয়তঃ সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ সংগঠন থেকে বহিস্কার করতে হবে। সন্ত্রাসীদের লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানে বিরত থাকতে হবে সরকার ও রাজনৈতিক দল সমূহকে। এর জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বয়কট করতে হবে সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনগুলোকে।

চতুর্থতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতৃপক্ষের সন্ত্রাস নির্মূলে সদিচ্ছা সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের ব্যাপারে শিক্ষক সুলভ দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণের পরিবর্তে তারা যদি রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রনোদিত হন তাহলে সন্ত্রাস নির্মূলের চিন্তা সুদূর পরাহত। সুতরাং শিক্ষকদের আরো বেশী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চমতঃ ছাত্র ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাগ্রহণ করা। হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘৃণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখানে আমরা সন্ত্রাস নির্মূলে আমেরিকান নিগ্রো বুদ্ধিজীবিদের দুটো সুপারিশের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম পরামর্শ হল এই যে, সন্ত্রাস নৈরাজ্য এবং এ ধরনের মানসিকতা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহশিক্ষার পরিবর্তে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রচলিত ধর্মহীন শিক্ষা ববস্থাও সন্ত্রাসের জন দায়ী। অতএব এর আমূল পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আশার প্রদীপ ইসলামী ছাত্র শিবির

উপরের আলোচনা সামনে রাখলে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ গড়ার, মেধা ও মননের বিকাশ কেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ সন্ত্রাসীদের লালন, পালন ও বিচরণ ক্ষেত্র। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই আজ উদ্বিগ্ন 'এর অবসান চায় সবাই। জাতির আকুতি 'আর লাশ নয়, শিক্ষাঙ্গনে মানবতার বিকাশ চাই।' কিন্তু এর জন্য ভূমিকা পালনে আন্তরিকবাবে এগিয়ে আসছে না কেউ। মুখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুলি, অন্যদিকে সন্ত্রাস তোষণ আজকে যেন বিঘোষিত জাতীয় নীতি। শিক্ষক বুদ্ধিজীবি চিন্তাশীল মহল সন্ত্রাসের মোকাবেলায় বুদ্ধি বৃত্তিক প্রতিরোধে এগিয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করছেন। এক্ষেত্রে দেশের সরকারী দল এবং প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। তারা সন্ত্রাসীদের প্রত্যাখান করার পরিবর্তে ফুলের মালা দিয়ে তাদের বরণ করে সন্ত্রাসের রাজনীতিকে উৎসাহিত করছেন। আর সন্ত্রাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে হিংসা, জিঘাংসা আর হানাহানির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সুশিক্ষা গ্রহণের রঙ্গীন স্বপ্ন নিয়ে আগত নীরিহ তরুণ শিক্ষার্থীরা এ দূষিত পরিবেশের শিকার হয়ে হতাশায় নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি ছাত্র সমাজের মাঝে জন্ম দিচ্ছে নতুন আশার আলো এবং উদ্দীপনার জাগরণ। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে হত্যা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য নিরসনের লক্ষে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য। শিবির বরাবরই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উচ্চ কণ্ঠ। সম্মিলিত বিরোধিতার মোকাবেলায় শিবির ধৈর্য, আদর্শ ও চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে জয়ী হতে চায়। বিরোধীদের শত উস্কানী ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় উত্তেজিত না হয়ে আদর্শ ও গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকাশে বদ্ধ পরিকর। তাই দেখা যায় শিবির প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে কোন সন্ত্রাস নেই। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলের দিকে নজর দেব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী মিডিয়া সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত অভিমত হচ্ছে এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ অলীক কল্পনা প্রসূত। সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে রাজনৈতিক বিভাজ্য আছে। মতাদর্শগত পার্থক্য আছে সকল মতের অনুসারী ছাত্রছাত্রীরা সুষ্ঠু পরিবেশে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে সন্ত্রাস মূলক কার্যকলাপের অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তর ও ভিত্তিহীন।"

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়।" পাশাপাশি চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদে ৮৬ সাল থেকে শিবির অধিষ্ঠিত। লক্ষণীয় যে এ কলেজটিই ১৯৮৭-৯১ সাল পর্যন্ত পরপর চারবার বিভাগীয় ভিত্তিতে এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। কক্সবাজার কলেজ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ খুলনা বিএল কলেজ রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গত ৭ বছরেরও অধিক সময় ধরে সন্ত্রাস নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির শক্তিশালী সন্ত্রাস সেখানে নির্মূল। অপরদিকে ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরকে অগণতান্ত্রিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা দেখছি সন্ত্রাস এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপেই আছে। কবির ভাষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডাকাতের গ্রাস'। আন্তদলীয় কোন্দল, সামান্য পানি খাওয়ার ন্যায় তুচ্ছ ঘটনার নির্মম শিকার নিরীহ ছাত্র বুলবুল, নিজদলের কর্মীদের হাতে মনিরুজ্জামান বাদল, গালিব হাসান লিটনের মতো নেতাদেরও হত্যার শিকার বানানো, এমনকি শিক্ষক পেটানোর মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও এখানে ঘটছে। তাদের হামলায়, ইতিমধ্যে শিবিরের ৬৬ জন নেতা ও কর্মী শাহাদাত বরণ করেছেন। আশ্চর্য হই যখন তারাই আবার নির্লজ্জের মতো ৬৬ জন নেতা ও কর্মী শাহাদত বরণ করেছে। শিবিরকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে গালি দেয়। তাদের এহেন অবস্থা। চোরের মা'র বড় গলা এ পুরনো প্রবাদকেই কেবল স্বরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের উত্থান একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন। একথা আজ দেশ প্রেমিক মহল অকপটে স্বীকার করছেন। বিশেষ করে অতীতের বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর বর্তমানের আদর্শিক দেউলিয়াপনা, অন্তকোন্দল, সংঘাত, নৈতিক অবক্ষয়, সাংগঠনিক বিপর্যয়, মেধা শূণ্য সন্ত্রাস নির্ভর নেতৃত্ব, কর্মসূচী হীনতা তথা সামগ্রিক অন্তসারশূন্যতা শিক্ষাঙ্গনে অমানিশার যে অন্ধকার ডেকে এনেছে তার প্রেক্ষিতে শিবিরের উত্থান দেশ ও জাতির জন্য আশার উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা। হতাশার মাঝে আশার প্রদীপ জ্বালতে হলে যে চড়াইউৎরাই আর দূর্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতা, বাঁধা বিপত্তি, জুলুম নির্যাতন আর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে, শিবির সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শহীদের রক্ত ঝরছে। শহীদের রক্তের মত শক্তিশালী আর কোন জিনিস নেই, আর কোন কর্মপন্থা বা কর্মসূচীই একটি আন্দোলনকে তার গতিবেগ ততটা বাড়িয়ে দিতে পারে না যতটা পারে শহীদের রক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ ও কল্যাণকর করতে হলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বন্ধ ও আদর্শ চরিত্রবান, মেধা সম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরীর কোন বিকল্প নেই। তাই আজ শ্লোগান উঠেছে 'মেধা শূন্য, সন্ত্রাস নির্ভর চরিত্রহীন ছাত্র নেতৃত্ব পরিহার করুণ'। ইসলামী ছাত্রশিবির তারই বাস্তব প্রতিধ্বনি।

www.pathagar.com

এ স্মৃতি অদম্য সাহসেরঃ বেদনার নয়

মিয়া মুহাঃ গোলাম পরওয়ার

"আজ যদি শহীদ হতে হয় আমিই হব। আপনারা আসুন আমার সাথে" আল্লাহরই জন্য জীবন বিলাবার এ ডাক ছিল সেদিন মুন্সী আঃ হালিমের।

প্রখর রৌদ্রতপ্ত ২০ সেপ্টেম্বরের দুপুর। বিএল কলেজে ছাত্রদলের লোমহর্ষক, রক্তক্ষয়ী হামলা চলছে– নামায ও খাবার জন্য ব্যস্ত শিবির কর্মীদের উপর। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত খুনীরা রক্তের নেশায় মত্ত। চর্তুমুখি গুলীবর্ষণ। ধারালো অস্ত্রের নির্মম আক্রমণ। আকস্মিক আক্রমনে ক্যাম্পাসে সকলেই হতবিহবল। উপস্থিত স্বল্প সংখ্যক সাথীদের নিয়ে প্রচন্ড ঈমানী প্রত্যয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন আঃ হালিম খুনীদের রুখতে। দিনভর পরিশ্রম ও ক্ষুধায় ক্লান্ত তাঁর দেহ। শাহাদাতের তামান্নায় যেন তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে। দীর্ঘ মোকাবিলা। প্রানান্তকর লড়াই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিন্দাদিল শিবির কর্মীরা। সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গুলীবিদ্ধ হচ্ছে। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে। রক্তমাখা দেহ নিয়ে এগিয়ে চলছে সন্মুখ পানে। ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা পরাস্ত ও ভীত হয়ে পিছু হঠছে কয়েকবার। ক্যাম্পাস ছাড়ছে। কিন্তু বাহির থেকে আসছে নতুন করে ভাড়াটিয়া খুনী, আর অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাপ্লাই। হায়েনারা খুনের নেশায় নবউদ্দামে মেতে উঠছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মোকাবিলায় খালি হাত। ঈমানী শক্তির একক অসম যুদ্ধ। ময়দানে তখন শিবিরনেতা আঃ হালিম, আঃ রহীম মাহফুজ, রহমত আলী মাকসুদুর রহমান মিলন ও হাফিজ সহ কয়েকজন। মোকাবিলা হচ্ছে ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্ত ভাবে। গুলীবিদ্ধ মিলন ভাইকে নিরাপদে রাখার জন্য সাথীরা তাকে নিয়ে চললেন মসজিদে। কিছুক্ষণ পরে হালিম ভাই এসে হাজির হলেন মসজিদেঅমনি রক্ত পিপাসুরা ধেয়ে এল। মসজিদ ঘিরে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা শুরু করল প্রচন্ড গুলী ও বোমাবর্ষণ। দরজা ভেঙ্গে ঢুকল মসজিদে। এক পর্যায়ে মসজিদের বাইরে ধারালো অস্ত্রের নির্মম আঘাতে আঘাতে, কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা ছিন্ন ভন্ন করল আঃ হালিমের দেহ। কাছ থেকে গুলী করে ঝাঝরা করল হাফিজের দেহ। লুকিয়ে পড়ল সে রক্তাক্ত দেহে মসজিদে। রক্তে লাল হয়ে উঠল আল্লাহর ঘর মসজিদ। শেখ রহমত আলীকে তিতুমীর হলের ভেতর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুটিয়ে তার অবশ নিথর রক্তাক্ত দেহ টেনে হেচড়ে নিয়ে এল হল থেকে মাঠের দিকে। হলের সিঁড়ি রাস্তা আর সবুজ মাঠ রহমতের চাপ চাপ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। হালিম ভাইয়ের নিথর দেহ টেনে হেচড়ে মসজিদ থেকে বাইরে নিকটস্থ পুকুরে ছুড়ে দিল খুনীরা। সেখান থেকে টেনে তুলে অসাড় রক্ত লাল দেহখানি ঘাটের উপর তুলল। গলায় ছু চালালো ওরা আঃ হালিমের। বুক আর মাথা চেপে ধরে পেশাদার কসাইকে ও হার মানালো।

সংঘর্ষের দিন দুপুরে খবর পেয়েই আমি ছুটলাম। দে গুলীবিদ্ধ। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে শিবির কর্মীরা আসছেন শ্রমি কল্যাণ অফিসে। খবর এল খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় এতি আমানকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। বিএল কলেজের ভয়া সংঘর্ষের খবর জানলাম। গুরুতর কয়েকজনের খবর পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে এলেন খুলনা মহানগরী জামায়াতে আমীর অধ্যাপক আঃ মতিন ভাই। এলেন শিবির সভাপতি অ ওয়াদুদ। একে একে এলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আহতদের কাউকে শ্রমিক কল্যাণ অফিসে প্রাথমিক চিকিৎস ব্যবস্থা করা হল। কাউকে পাঠানো হল খুলনা মেডিকেল কলে হাসপাতালে। কলেজ থেকে সরাসরি অনেক আহতদের পুলিশে গাড়ী ও বিভিন্ন যানবাহনে নেয়া হল হাসপাতালে। ইমার্জে থেকে অপারেশন থিয়েটার। যেন লাল রক্তের স্রোত বইছে আহতদের আহাজারি, সাথীদের বুক ফাটা কান্না মর্মস্পর্শী দৃশ্য। নিথর দেহ হালিম, রহমত হাফিজকে যখন হাসপাতা আনা হল তখন লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ল বোধ হয় হালিম ভা নেই। রহমত ভাই নেই।

চতুর্দিকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়া সংবাদে পাগলের ম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা একদিকে হাসপাতাল অন্যদিকে শ্রমিক কল্যাণ অফিসে জড় হতে লাগলেন। হু হু করে কাঁদ শিবির কর্মীরা। হালিম ভাই কোথায়? কি অবস্থা তার? বহু ক করে ও হালিমের সাথীদের ধৈর্য ধরাতে পারছিলাম না। উপু হয়ে চিৎ হয়ে শ্রমিক কল্যাণের চত্বরে আর্তচিৎকার করছিলেন।

আঃ হালিমের খবরের জন্য বার বার হাসপাতালের ইমার্জেন্সী টেলিফোন করছি। একবার দৌলতপুর কলেজের জিএস কামরু ভাই ইমার্জেন্সী থেকে জানালেন "অবস্থা বেশী ভাল না। তে ডাক্তাররা চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। কিছুক্ষণ পর আবার খব পেলাম– "হালিম ভাই শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন।"

শাহাদাতের চির সবুজ লালিত চেতনা ছিল হালিমের। সে ত নিজের ডাইরীতে লিখেও এ আকাংখা ব্যাক্ত করেছিল– "আমি যেন শহীদ আঃ মালেক, শাহিদ হামিদ ও অসংখ্য শহীদদে মিছিলের সাথী হতে পারি। আমি ও আসছি শহীদদের মিছিলে। মা'বুদের প্রিয়তম সে হালিম চলে গেলেন– তারই জীবনে মালিক, আরশে আজিমের মালিক, দয়াময় সে মা'বুদের কাছে। শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হল সে। হল অতৃ আত্মার মহাতৃপ্তি। নীরব বিস্ময়ে দেখল দুনিয়া– এ যুগে কারবালার এক হোসাইনকে। ফিরিশতারা দেখল নির্মল এ পড়ন্ত বিকেলে আল্লাহর সাথে তাঁর এক বান্দাহর অকৃত্রি মহাপ্রেম। হালিম ভাইকে হারানোর শোক যেন প্রচন্ড বেদ হয়ে বিদ্ধ হল বুকে। পাথর হলাম। কি বলব এখন ক্রন্দনরত শ

www.pathagar.com

ত শিবির কর্মীদের? কি বলব এখন ক্রন্দনরত শত শত শিবির র্মীদের? কি বলে সান্ত্বনা দেব ওদের? শ্রমিক কল্যানের সামনে পেক্ষমান শত শত কর্মীদের সান্ত্বনা দেবার– বুঝাবার চেষ্টা রলাম মহানগরী আমীর সহ সকলে মিলিত হয়ে।

হেন শোকাহত পরিবেশ– এমন নির্মম হত্যাান্ড। তবুও ত্রদলের খুনীরা ক্ষ্যন্ত না হয়ে হাসপাতালের পথে পথে আহত ও ধারণ শিবির কর্মীদের উপর উপর্যপুরি হামলা ও আক্রমণ লাতে লাগলো। চতুর্দিকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে– ত্রাস আর ত্রাস। মহানগরী আমীর অধ্যাপক আঃ মতিন ভাইয়ের তড়িৎ ও রিকল্পিত নির্দেশে পরবর্তী সকল দায়িত্ব নিয়ে আমরা বিভিন্ন য়িত্বে নিয়োজিত হলাম।

হীদের লাশের পোষ্টমর্টেম, মামলা, আহতদের সেবা, গাসনিক যোগাযোগ, জনশক্তির মোটিভেশন, জানাজা, দাফন ত্যাদি কাজে দায়িত্বশীলরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খুলনা সপাতাল থেকে পোষ্টমর্টেমের জন্য শহীদের লাশের সাথে আমি র্গে গেলাম। সেখান থেকেই পুলিশের সন্দেহজনক আচরণ ও াম বৈরীতায় আমরা বুঝতে পারলাম বিএনপি'র ষড়যন্ত্র। লাশ মাদের দেয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হল। কেন্দ্রীয় ও নীয় নেতৃবৃন্দের সব প্রচেষ্টা চালিয়েও লাশ তো পাওয়া গেলই । বরং গভীর রাতে শহীদ আঃ হালিমের লাশের কাছ থেকে য় ৪০ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হল। শহীদ আমানের শ গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হল সাতক্ষীরায় তার গ্রামের ড়ীতে। সেখানেও পরে নেতৃবৃন্দ রওয়ানা দিয়ে গেলেন এবং ফনে অংশ নিলেন।

মাদের দাবী ছিল শহীদ হালিমের প্রাণের বিদ্যাপীঠ বিএল লেজে তার জানাজা ও দাফন হবে। কিন্তু প্রশাসন তা দিল না। কালে পুলিশের দায়িত্বে লাশ শহীদের বাড়ী ফুলতলার মশিয়ালী মে রওয়ানা হল। আমাকে দ্রুত লাশের সাথে শহীদের বাড়ীতে বার দায়িত্ব দেয়া হল। মোটর সাইকেলে ছুটলাম। পথের পার্শ্বের গাছপালা মানুষ, সব যেন শোকাহত। আমি যেন এক র্জন, বেদনাহত মৃত পুরীর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছি। লিশপুর থেকে পথের বাজার। পথটুকু কিভাবে সেদিন য়েছিলাম, আজও তা ভাবতে বুকের মধ্যে শূন্যতা বোধ করি।

লনা– যশোর মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে আর শান্ত প্রবাহমান ভৈরব দীর পশ্চীম তীরে প্রাচীণ ঐতিহ্যমন্ডিত শহীদের বাড়ী। যখন ীছিলাম, দেখি বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত শহীদের শোকাহত থীরা আসছে দূর–দূরান্ত থেকে। শহীদ আঃ হালিমের সম্মানিত তা মুন্সী মোহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে প্রাণভরে সান্ত্বনা পেলাম। তাকে ধৈর্যের আবেদন জানালাম কিন্তু পিতা পাথর। শহীদের ই আঃ হাই, আঃ হামিদ, হাকিম ও হাসিব সহ অন্যান্য ভাই ান মাকে কি বুঝাবো? নিজেকেই তো নিজে সামাল দিতে রছি না। যা সে অন্তরের আবেগ, তাই বললাম তাঁদের। কিন্তু াতে তাঁদের আহাজারি থামাতে পারলাম না।

দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশ "তাড়াতাড়ি দাফন সম্পন্ন করতে হবে। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম শহীদের অনেক সাথীরা আসবে। দূরদূরান্ত থেকে। দেখবে শেষ বারের মত শহীদকে। তাই সময়মত আমরা দাফন করব।

শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সহ–সভাপতি শহীদের প্রিয় কামরুল আলম ভাই, আর এক কাছের নেতা কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক গেলাম কুদ্দুস ভাই এসেছেন ঢাকা থেকে। মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী আহাদ ভাই শিবির সেক্রেটারী মন্টু ভাই বেলাল ভাই, সিরাজ ভাই মিজান ভাই সহ আমরা কয়েকজন পরামর্শ করলাম বিভিন্ন করণীয় বিষয়ে। মারাত্মক আহত শেখ রহমত আলীকে ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হল সকালেই। বৃহত্তর খুলনা ও যশোরের দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্র জনতার ঢল নামলো শহীদের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে সিড়ির পার্শ্বে রাখা আছে শহীদের লাশ। তাঁর সারা দেহে হায়েনাদের নির্মমতার করুণ চিহ্ন। সুঠামদেহী তরুণ শহীদ আঃ হালিমের চেহারায় আল্লাহর নূর যেন চমকে উঠছে। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি যেন মিশে আছে। সে দৃশ্য চোখ ভরে দেখে দেখে কাঁদছে শহীদের হাজারো সাথী।

শহীদের পিতা আমাকে বললেন, "কবর কোথায় হবে আপনি জায়গাটা দেখিয়ে দিন।" আমি কয়েকজন ভাইকে নিয়ে রাস্তার পাশে কবরের জায়গাটা চিহ্নিত করলাম। বললাম, "শহীদের কবর এ রাস্তার পাশেই হোক। যুগে যুগে শহীদের অসংখ্য সাথীরা আসবে। রাস্তার পাশে হলে সহজেই কবর দেখতে পাবে। আর শাহাদাতের স্মৃতি লালন করবে।" সেখানেই কবরের জায়গা চূড়ান্ত হল।

এদিকে শহীদের গোসল সুসম্পন্ন হল জেলা আমীর মওঃ একেএম গউসুল আযম হাদীর দায়িত্বে। জানাজার বিশাল জামায়াত অনুষ্ঠিত হল শহীদের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত দামোদর উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে। শহীদের বাড়ীর সন্নিকটেই এ বিশাল ময়দান। কর্দমাক্ত মাঠে হাজার হাজার শোকাহত মানুষের জামায়াতে ইমাম হলেন এতদঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের নবীণ ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব জনাব মাষ্টার আঃ রাজ্জাক। শোকার্ত মানুষের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখলেন। বিএল কলেজের অধ্যক্ষ কাজী রফিকুল হক সহ শহীদের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও এলেন জানাজায়। শেষ দেখা সেরে শহীদের লাশ রাখা হল কবরে শীতল মাটিতে। কান্নার গোংগানী যেন ঝড়ের বেগে বেড়ে উঠল। দাফন শেষে আল্লাহর দরবারে শহীদের জন্য, তার সাথীদের জন্য কান্না জড়িত কাতর কণ্ঠে মুনাজাত করলেন বিএল কলেজের শিবিরের প্রথম সভাপতি ও উত্তর জিলা আমীর হাদী ভাই।

পড়ন্ত বেলায় সূর্যের লাল ছটা পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। হৃদয়ের শোকার্ত কোনেও জমেছে রক্তিম আভা। এখন শহীদ কে রেখে সকলের বিদায়ের পালা। কিন্তু শহীদ পরিবারের বুক ফাটা

www.pathagar.com

কান্নায় কদম যেন থমকে যায় সকলের।

এ নির্মমতা এ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ হল বিএনপি'র ষড়যন্ত্রে পুলিশের হুকুমে। শহরের শিবিরের জন্য যেন মহাবিপদ। দৌলতপুর খালিশপুরে বিডিআর নামানো হল। হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের ১২দিন পর ২রা অক্টোবর মারাত্মক আহত শেখ রহমত আলী ঢাকা মেডিকেল কলেজে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। এ খবর খুলনায় ছড়িয়ে পড়তেই নগরবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের ব্যারিকেড তুলে, মিছিলে মিছিলে খুলনা উত্তাল। শোকে অনেকে মুহ্যমান। পুলিশকর্তারা বিএনপি'র মর্জিতে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ও হয়রানী শুরু করল। শিবির শহরের যেখানেই সভা ডাকে সেখানেই সভাস্থলে ছাত্রদলের সভা, ১৪৪ ধারা।

সরকারের এহেন জুলুমে বিক্ষুব্ধ হল নগরবাসী। ঘৃণা ধিক্কার দিয়েছে খুনীদের। পুলিশ খুণীদের কাউকে গ্রেফতার করল না- সুনির্দিষ্ট মামলা থাকা সত্ত্বেও। প্রতিবাদী মানুষের বিবেক জাগ্রত হল প্রশাসনের বিরুদ্ধে। শহীদ আঃ হালিমের রক্ত খুলনার মানুষকে আলোড়িত করেছে। বেদানায় কাতর না করে বিক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন এক নতুন শক্তিতে পরিণত করেছে শহীদের সাথীদের।

আঃ হালিম ভাইয়ের সাথে আমার শেষ কথা হয় শাহাদাতের ৬ দিন পূর্বে ১৩ই সেপ্টেম্বর রাতে খুলনা জামায়াত অফিসে। আমি এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান মোংলার সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সেরে কেবল খুলনা জামায়াত অফিসে এসেছি। কিছু পরেই খুব ব্যস্ত পেরেশান হয়ে হালিম ভাই আরও কয়েকজন এলেন অফিসে। ছালাম, মুসাফাহা, হারুণ ভাইয়ের সাথে পরিচয়, কলেজের খবর ইত্যাদি। হালিম ভাই টেলিফোনে কলেজের খবর নিচ্ছিলেন- নাকি বোমাবাজি হচ্ছে। অল্প সময়ে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে হালিম ভাই হলে ফিরে গেলেন।

বিএল কলেজের খুব কাছে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অফিস। তাই হালিম ভাইসহ নেতারা প্রায়ই অফিসে আসতেন। খবর জানাতেন সহযোগিতা চাইতেন। যেযন এক দেহ এক মনে একাত্ব বোধ হত। এ যেন শিবিরের অফিস। ছোট খাট সংঘর্ষে আহতরা ছুটে আসে। বিশ্রাম নেয় এখানে।

হালিম ভাইদের গ্রাম আর আমার গ্রাম একেবারে পাশাপাশি। তাতে দ্বীনি সম্পর্ক যেন গভীরতর অনুভব করতাম আমি। অল্প বয়সে এত দ্রুত সাংগঠনিক প্রজ্ঞা অর্জন, নির্ভীক ও গণমুখী নেতৃত্বের অনুপম গুনাবলীতে সে সমৃদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা তাকে বিপুল সম্ভাবনাময় মনে করতাম। নীরবে, একাকী হালিম ভাইকে নিয়ে আমার গর্ব হত। হৃদয়ে হালিমের ভাবনা আমাকে আবেগময় করে তুলত। বেশী প্রাণবন্ত ও আশান্বিত হয়ে উঠতাম তখন, যখন দেখতাম হালিমের বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ। নেতৃত্বের দারুণ যাদুকরী-মোহনীয় ক্ষমতা। হালিম ছিল আমাদের প্রায় দু'যুগের লালিত স্বপ্নের গোলাপ। পরম আকাংখার ধন। দেখা হলেই শহীদের মুখের প্রানোচ্ছল হাসি- ওর জীবনের সার্বক্ষণিক চঞ্চলতা আমাকে শীতল করে দিত। হালিম ভাইয়ের মুখের কুরআন তিলাওয়াত আমাকে মোহিত করত।

হালিম ছিল অসম সাহসী তরুণ। বাতিলের হৃদকম্প। সব ঝুঁকি, মোকাবিলায় হালিম সামনের সারিতে। নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতা তার সাথী। দায়ী ইলাল্লা'র ভূমিকায় সাধারণ ছাত্রদের কাছে প্রিয় হালিম ভাই। শাহাদাতের দিন শুরু থেকে হুশ থাকা পর্যন্ত লড়েছে সে নির্ভীক ভাবে। প্রত্যক্ষ দর্শীর সূত্রে এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন- "পরওয়ার ভাই, হালিম ভাইকে যখন খুনীরা গলায় ছুরি চালাচ্ছিল বুক এবং মাথা চেপে ধরে, তখন সে মোটেই ছটফট করেনি- বাঁচার চেষ্টা করেনি। বরং স্থির শান্ত হয়ে সে নিথর দেহে আল্লাহর দিকে চেয়েছিল।"

তাই শহীদ আঃ হালিম আমাদের মধ্যে জাগিয়েছে আল্লাহর রাহে জীবন দেবার অদম্য প্রেরণা। বক্তব্যে, চিন্তায়, কাজের ফাঁকে শহীদ আঃ হালিম এক দারুণ অভিব্যক্তি আজ। তার কথা মনে পড়লে সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে আসে। তাই তো বুঝি শহীদরা এভাবেই বেঁচে থাকে মানুষের মাঝে।

যখন যাই শহীদের কবরের পাশে। শহীদের পিতা মাতা ভাই বোনের কাছে। তখন বেদনা চাপা দিয়ে এক রাশ সাহসে বুক বাঁধি। শহীদের আমরণ স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকারে সজীব হয়ে উঠি। আবার ঘরে ফিরে যখন আমার চার বছরের কন্যা লামিয়ার কচি কণ্ঠে এ গান শুনি- তখন জীবনের এক নতুন স্বাদ পাইঃ "মন যে আমার টিকে নারে এই দেশে তে হায়রে-
শহীদ হালিম নাও গো ডেকে
সুখের জান্নাতে রে- সুখের জান্নাতে রে।
হালিম, আমান রহমত আলী
আমার ৩টি ভাই- আল্লাহর রাহে জীবন দিল
বেহেশত পাবে তাই রে- বেহেশত পাবে তাই।
হালিম ভাইয়ের রক্তে ভেজা-
২০শে সেপ্টেম্বরে- ডেকে গেল শত মানুষ-
শহীদি কাফেলায় রে- শহীদি কাফেলায়।"

খুলনার ইসলামী আন্দোলনে শহীদ মুন্সী আঃ হালিম এক অদম্য সাহস। যখন দেখি শহীদ হালিমকে হারিয়েও তাঁর আহত সাথী মিলনকে দশটির মত গুলী শরীরে নিয়ে আজো মিছিলে মুষ্টিবদ্ধ বাহু। আহত রহীম, মাহফুজ, হাফিজ সহ সবাইকে মিছিলের সারিতে বলিষ্ঠ চিত্তে যখন দেখি, তখন এ প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয় যে, এ স্মৃতি সাহসের- বেদনার নয়। শহীদ বিমান, হালিম, আমান, রহমত আমাদের স্পর্ধিত শক্তির অফুরন্ত আঁধার। এঁদের হারানোর শোক আজ বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের রক্তে সঞ্চিত কর সে শক্তি- সে সাহস। আত্মত্যাগের সে অদৃশ্য পিপাসা দাও! এই আমাদের মুনাজাত।

www.pathagar.com

বন্ধু হারা
বি এল কলেজ ক্যাম্পাস

জি, এম, ইলিয়াস হোসাইন

দক্ষিণ বাংলার সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ খুলনার সরকারী বি, এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। দীর্ঘদিনের সুনামে মন্ডিত এই কলেজ। মেধা, জ্ঞান চর্চা, প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানকার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী সকলের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জ্ঞান চর্চা ও ছাত্র রাজনীতি চর্চার অনন্য প্রাণ কেন্দ্র এই কলেজ। যে কলেজে গড়ে ওঠা অনেক নেতৃত্ব আজ দেশ পরিচালনায় সুযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠার পর হতে এই কলেজে সক্রিয় পদচারণার মাধ্যমে বি, এল কলেজকে এক ভিন্ন আংগিকে গড়ে তুলতে ছিল সবসময় তৎপর। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাংগনে বিরাজমান সন্ত্রাস হতে বি, এল কলেজকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা, কলেজের সবধরনের সমস্যা সমাধানে ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিবিরের ভূমিকা ছিল সক্রিয়, যে কারণে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবির কয়েক দফা বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে। শিবির সংসদে থাকা অবস্থায় কলেজের উন্নয়নে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। যে কারণে শিবির সংসদে থাকাকালে বি,এল কলেজ বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে প্রেসিডেন্টের পুরস্কার ও অনেক সরকারী অনুদান লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী ছাত্র সংগঠন গুলো শিবিরের এ জনপ্রিয়তা সহ্য করতে না পেরে শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করেও মোকাবেলা করতে না পেরে, ১৯৮৯ সালে নির্বাচনের একদিন আগে সর্বলীয় ছাত্র ঐক্য পরাজয়ের আশংকায় শিবিরের নির্বাচনী মিছিলে গুলী চালিয়ে শাহাবুদ্দিন ধীরা ও ফরিদসহ অনেককে নির্মমভাবে আহত করে নির্বাচন ভন্ডুল করে দেয়। সেই হতে পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বি, এল কলেজে এ ইসলামী ছাত্র শিবিরের অগ্রযাত্রাকে নস্যাতের অপপ্রয়াস চলে আসছে।

১৯৯২ এর ২৫শে মার্চ ২০শে রমজান। ইফতারী সেরে মাগরিবের নামায আদায় করে শিবিরের অফিসে আমরা বসে আছি। বিমান ভাই আমাকে বললেন, খুব ক্ষুধা পেয়েছে- বাসায় যেতে চাইলেন। আমি বললাম পরে যাবেন। মুড়ি আর ছোলা খাচ্ছিলেন। খবর এলো ঢাকা থেকে টেলিফোন এসেছে। আমি পাশে জামায়াত অফিসে টেলিফোনে কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ ভাইয়ের সাথে কতা বলছি, হঠাৎ করে গুলী আর বোমার শব্দ শুনে এগিয়ে দেখি শিবিরের অফিসে তথাকথিত ঘাদানিকরা হামলা করেছে। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র আর মশাল জ্বালিয়ে কমরেড ফিরোজের নেতৃত্বে খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে শিবিরের অফিস ঘিরে ফেলে শিবিরের হাতে গোনা কয়েকজন নিরীহ কর্মীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করছে। আমিনুল ইসলাম বিমান, আঃ ওয়াদুদ ও জাহাঙ্গীরসহ অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আমিনুল ইসলাম বিমানকে ভর্তি করা হলো ২৫০ শয্যা হাসপাতালে। সমস্ত শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরছে। রাত ১১-৫৫ মিঃ। কর্তব্যরত ডাক্তারের বিমর্ষ ভাব দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি বিমান ভাইয়ের হাত ধরে নাড়ী খুঁজতে লাগলাম। বিমান ভাই মুখ উঁচু করে কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারলেন না। মুখে পানি দিলে বিমান ভাই হঠাৎ জ্ঞান হারালেন। শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আমাদের মাঝ হতে চলে গেলেন।

১৯৯৩ ইং ২১শে সেপ্টেম্বর সাদেক ভাইয়ের টেলিফোনে জানতে পারলাম বি, এল কলেজে ছাত্রদল শিবিরের উপর হামলা করেছে। জি, এস, হালিম ভাই, মিলন ভাই, রহমত ভাই ও হাফিজ ভাইসহ অনেকে মারাত্মক আহত হয়েছে। হালিম ভাইয়ের অবস্থা আশংকাজনক। ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে পৌঁছে শুনলাম হালিম ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হাসপাতালের বারান্দায় হালিম ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে। কিছু পরে পুলিশ এলো, শহীদ হালিম ভাইয়ের সুরত হাল নিতে। সমস্ত শরীর রক্তে ভেঁজা, পুলিশ এক এক করে শরীরের সমস্ত ব্যান্ডেজ খুলে সুরত হাল লিখেছে। দেখলাম পাষন্ডরা কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হাত পায়ের রগগুলো কেটে দিয়েছে। গলায় রামদা চালিয়ে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করেছে। লাশের বীভৎস রূপ দেখে অনেকেই মুর্ছা গেলেন। রহমত ভাই, হাফিজ ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ, মিলন ভাইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম রহমত ভাইয়ের অবস্থা ভাল নয়, ঢাকায় পাঠাতে হবে। ঢাকায় পাঠানো হলো চিকিৎসার জন্য, কিন্তু ১২ দিন ভোগার পরে ২ অক্টোবর আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনিও চলে গেলেন।

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান এম, এ পূর্ব-ভাগের ছাত্র বি, এল কলেজ ক্যাম্পাসের শিবিরের সেক্রেটারী। শহীদ মুন্সী আঃ হালিম হিসাব বিজ্ঞান ৩য় বর্ষের ছাত্র, শিবিরের বি, এল কলেজ শাখার সভাপতি ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জি,এস। শহীদ শেখ রহমত আলী এম, এস, ৩য় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্ষের ছাত্র, ক্যাম্পাস শাখাশিবিরের সভাপতি ও কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক।

শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান, শহীদ মুন্সী আঃ হালিম ও শহীদ শেখ রহমত আলী বি, এল কলেজের তিন বিরল প্রতিভা। যাদের চরিত্র, ব্যবহার, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের ছোঁয়া বি, এল কলেজের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে আছে। কিন্তু যাদের পদচারণা ফুরিয়ে যাওয়ায় বি, এল কলেজ ক্যাম্পাস আজ স্বজন ও বন্ধু হারা বেদনায় সিক্ত। আজ বি, এল কলেজ ক্যাম্পাসে শোনা যায় না শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের সেই বজ্রকণ্ঠের গগণ বিদারী শ্লোগান, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানবো না, মুক্তির রাজপথ ইসলামী বিপ্লব। শোনা যায় না মুন্সী আঃ হালিমের হৃদয় স্পর্শী ভাষণ- বিএল কলেজ গড়ার অংগীকার। মহসিন হল মসজিদে নামাযের ইমামতী আর সুরেলা কণ্ঠে কোরান তেলাওাত। শোনা যায় না শহীদ তিতুমীর হলে নামাযের পূর্বে শহীদ শেখ রহমত আলীর কণ্ঠে আযান ধ্বনি আচ্ছালাতু খায়রুম মিনাননাউম।পাষন্ড খুনীরা কেড়ে নিয়েছে বিএল কলেজের সবুজ বাগানের তিন তিনটি তাজা ফুলকে। যাদের হারানো বেদনা কাঁদিয়ে রেখেছে বি, এল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভাইবোন, শিক্ষক, কর্মচারী ও খুলনার অভিভাবক মন্ডলীকে।

www.pathagar.com

রক্তাক্ত ২০শে সেপ্টেম্বর একটি মূল্যায়ন

মিয়া গোলাম কুদ্দুস

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ভাইয়ের অফিস। তৎকালিন কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ হুসাইন আযাদ ভাই,শেখ কামরুল আলম ভাই সহ আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য তৈরী করছি। বিকাল ৫টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গণ সমূহে সরকারী ছাত্র সংগঠনের পরিচালিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বক্তব্য তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। সবাই উদ্বিগ্ন কারণ তখন একেরপর এক সংবাদ আসছে বিভিন্ন জায়গায় শিবিরের উপর আক্রমণের। আবার কোথায় কি ঘটলো, এমন উৎকণ্ঠা সবার চোখে মুখে। কামরুল ভাই ফোনের রিসিভার রেখে চেহারায় এক উদ্বিগ্নতার ছাপ এঁকে বললেন বি, এল কলেজে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। হালিম, রহমত মিলন ভাই গুরুতর আহত। খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে আমান শহীদ হয়েছে। আমাকে বলা হলো সম্মেলনের বক্তব্যে এ ঘটনা যোগ করতে। সংগ্রামের কমিউটার কক্ষে কাজ করছি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠ আর তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আরও কোন শহীদের খবরের প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছি।

এমনি ভারাক্রান্ত আবেগাকুল উদ্বিগ্নতা নিয়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসের সিড়ি বেয়ে উঠতেই একটি খবর যেন বুকের ভিতর শেলবিদ্ধ করলো। আমাদের গাড়ীর চালক সাত্তার ভাই জানালো বিএল কলেজের জিএ, আবদুল হালিম ভাই আর নেই। সেদিন বুকের ভিতর কান্না ধরে রাখতে পারিনি। শহীদ হালিম পরে এসে সবার আগে জান্নাতে চলে গেলেন। আর পিছনে রেখে গেলেন তার গোনাহগার দায়িত্বশীলদের। কতবার শহীদ হওয়ার মওকা পেয়েছি। কিন্তু শহীদ হওয়ার সুযোগ হয়নি। আল্লাহ যাকে কবুল করেন শুধু সেই শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। এই নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঢাকার শহীদের সাথীরা প্রকম্পিত করে তোলে রাজপথ মিছিলে কান্নায় ফেটে পড়ে শিবির কর্মীরা। মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতির নির্দ্দেশে কামরুল ভাই এবং আমি রাতেই শহীদী জনপদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেদিন রাতে চলন্ত বাসে শহীদের দু'জন দায়িত্বশীল এক অজানা উৎকণ্ঠা আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাতভর অনেক আলোচনা করেছি। পরামর্শ করেছিলাম কিভাবে আমরা এ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করবো। কেমন করে শহীদদের এ মূল্যবান রক্তে গড়ে তুলবো এ সবুজ জমীনকে। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শহীদ হালিম, আমানের স্বপ্নের খুলনাকে গাড় লাল রক্তের মূল্যে সাজিয়ে তুলবো। বাতিলের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবো। বিএল কলেজকে ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী ঘাটিতে পরিণত করবো।

কিন্তু আমরা শহীদের রক্তে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। যে প্রত্যয় আর প্রত্যাশায় বুক বেধেছিলাম, "শাহাদোত্তর দূর্বার আন্দোলনের কাঠিন্যতা আর শহীদ আত্মার প্রার্থিত পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করতে পেরেছি।" এ দাবী করার সাহস অন্তত আমার নেই। সামগ্রীকভাবে আজ আমাদের মূল্যায়নের সময় এসেছে। ২০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বাপর পরিস্থিতির মেকাবেলা, সদর হাসপাতাল মর্গে শহীদের লাশের জিম্মাদারী, জানাজা এবং দাফনোত্তর পর্বতময় সর্বগ্রাসী আন্দোলনের উত্তাল শহীদি কর্মসূচীতে শহীদের ত্যাগসম ভূমিকা তো দূরে থাক বরং প্রতি পদে পদে ভীরুতা, মৃত্যুভয়, দায়িত্বহীণতা আর দূর্বলচিত্ততাই আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। এ উপলব্ধি আজও আমাকে শহীদের আত্মার কাছে অপরাধী হিসেবে তাড়িত করে প্রতিমূহূর্তে। কিঞ্চিৎ হলেও সে মূল্যায়ণ হয়তো অতীতকে শুধরাবার কাজে লাগতে পারে।

আমি যখন একান্ত একাকি হই মনে পড়ে শহীদদের স্মৃতিকথা। শহীদ হালিম, রহমত, বিমান, আমানের আত্মা যেন তার সাথীদের আহবান করছে। কাছে ডাকছে। চিরমুক্তির জন্য তাদের সঙ্গী হবার।

শহীদ হালিমকেই বেশী কাছে থেকে উপলব্ধি করার জানার সুযোগ হয়েছে আমার। তার জীবদ্দশায় তাকে মূল্যায়নের অবকাশ না পাওয়ার আপসোস, হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। তিনি শুধু শিবিরের নেতা ছিলেন না। তাকে কি কিশোর কি যুবক কি বয়সী দলমত ধর্ম পেশা নির্বিশেষে সকলকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ মেলে শাহাদাতের পরের ঘটনা প্রবাহ। শহীদ হালিমের কফিন তার বাড়ীতে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। তার নিজের স্কুলসহ পার্শবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শতস্ফূর্ত ছুটি হয়ে যায়। ছাত্র শিক্ষকরা তাদের প্রিয় হালিমকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসেন। হিন্দু মহিলা পুরুষেরা তার লাশ দেখে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, আমাদের ঘরে রাস্তায় দেখা হলে খোঁজ খবর নিতেন। সাহায্য করতেন, তারমত ভালো ছেলে আর হয় না। শহীদ হালিমের থানায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতারাও সেদিন সমবেদনা প্রকাশ করতে এসেছিলেন। শহীদ হালিম তার শত সাংগঠনিক ব্যস্ততার মাঝেও, পরিবারের, ভাইবোনদের প্রতি তার দায়িত্ব একমূহূর্ত ভুলে যাননি। হালিম ভাই নিজে একদিকে বিএল কলেজের সভাপতি ও ছাত্র সংসদের জিএস এর সুকঠিন দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করতেন আর হলের খরচ ও পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কলেজ থেকে ৪/৫ মাইল দূরে নূরনগর গিয়ে টিউশনী করতেন।

শাহাদাতের কয়েকদিন আগে তিনি টিউশনির টাকা দিয়ে বোনদের জন্য স্নো, ক্রীম, শ্যাম্পু ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নির্মল চরিত্রের ছিলেন। তার চরিত্রের নির্মলতার প্রতি কেউ কোনদিন টু শব্দটি করতে পারেনি। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তেলাওয়াত করতেন। আমরা অভিভূত হতাম। এমন আখলাক যাদের তারাই শুধু শহীদ হতে পারে। শহীদ হালিম ছোটদের খুব আদর করতেন। ঈদসহ বিভিন্ন উপলক্ষে কার্ড পাঠাতেন। ছোদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রিয় হালিম ভাই। তার হাস্যোজ্জল মিষ্টি হাসি আর অমায়িক ব্যবহারই তাকে সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত করেছিল। আর তাই তো এত অল্প সময়ে বিএল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রাণপ্রিয় নেতা হতে পেরেছিলেন। হালিম ভাই দায়িত্বশীলদের যে কোন আনুগত্য পালনে ছিলেন সদা সজাগ। সুকঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন হাসী মুখে। আনুগত্যের প্রতি তার এই অবিচলতা তাকে বড় বড় দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করছিল। খুলনা মহানগরীর সভাপতি আঃ ওয়াদুদ ভাই, হালিম ভায়ের শাহাদতের পর বলেছিলেন, তাকে আমি খুলনা মহানগরীর ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম। কিন্তু প্রভূ তাকে কবুল করে নিলেন।

হালিম ভাই কম কথা বলতেন, বেশী চিন্তা করতেন, গভীর ভাবে ভাবতেন। শাহাদতের পূর্বে বেশ কিছুদিন থেকে এ ভাবান্তর যেন আরও গভীরতা পায়। এখন বুঝি শহীদ হওয়ার আকাংখা, শহীদ হওয়ার ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করতো। ২০শে সেপ্টেম্বর ঘটনার দিন সকালে বিএল কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর ভাই তার রুমে গিয়ে তাকে মুখে হাত দিয়ে এক গভীর ভাবনার নিমজ্জিত দেখেছিলেন। হয়তো তিনি শহীদ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাকে দেখেছি তার নিজের এলাকায় তিনি কিভাবে সংগঠন গড়েছিলেন। দ্বীনের পাগল ছিলেন যেন। সারাক্ষণ দাওয়াতী কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রভাবশালী পরিবারের সন্তানরাই ছিল তার প্রথম টার্গেট। অল্প সময়ের মধ্যে এলাকা কি একটি আদর্শ সংগঠনে পরিণত করেছিলেন। আজকে আমরা দাওয়াতী কাজ ভুলে গেছি। হালিম ভাইয়ের মত দায়িত্বের সেই পেরেশানী নেই। নেই কঠর পরিশ্রম। নিজের সমস্যার কথা তেমন বলতেন না। ওজর আপত্তি কাকে বলে জানতেন না। তার ছিল এক দূর্জয় আকাংখা নিজকে সবদিক থেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তার অদম্য স্পৃহা তাকে সাফল্যের পানে ধাবিত করেছিল। আমার চোখে দেখা হাতে গোনা কয়েকজন অসম সাহসী জিন্দাদিল আমাকে আত্মত্যাগের প্রতি বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। আত্মপ্রত্যয়ী করেছে। আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার লোভ সৃষ্টি করেছে। শহীদ হালিম তাদের অন্যতম। ইসলাম বিরোধীদের রক্ত চক্ষুকে তিনি কখনো পরোয়া করেননি। যতবার আমার উপস্থিতিতে সংঘর্ষের ময়দানে তাকে দেখেছি প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় এবং বিরত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি ঝাপিয়ে পড়েছেন। ২০ শে সেপ্টেম্বর শহীদ হওয়ার কিছু আগে ক্ষুধা আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে মসজিদে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অত্যান্ত সাহসীকতার সাথে লড়ে গিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি মসজিদে পাষণ্ডদের সশস্ত্র আক্রমণের চূড়ান্ত মুকাবেলা করেছেন। তিনি নিজের আত্মরক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো শহীদ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খুনীরা তার জান্নাত পাওয়ার অদশ্য ইচ্ছাকে বাস্তাবয়ন করলো নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যম। অনেকেই তো শহীদ হওয়ার আকংখা পোষণ করেন। কিন্তু কজন শহীদ হতে পারেন। আল্লাহ শুধু তার প্রিয় বান্দাদেরকেই কবুল করে থাকেন।

১৯৯২ সালে ঘাদানিকের হাতে শহীদ হয়েছিলেন শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান। ইসলাম বিরোধীদের দম্ভ তিনি সহ্য করতেন না। বিমান ভাই সব সময় চেতেন বাতিল মতাদর্শ উৎখাত করে ইসলামী আন্দোলনকে তার জমীনে একক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই সব সময় তিনি জীবনকে ঝুকি এবং সংঘাতের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। শাহাদত পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম আর বাতিলের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। শহীদ হালিম, রহমত, বিমান , আমান এর শাহাদাত বার্ষিকীতে আজ আমার অনুভূতিকে তীব্র দোলা দিচ্ছে। মনের কোন অজানা তন্দ্রীতে গভীর ক্ষভের সৃষ্টি করেছে। আত্ম উপলব্দি আর আত্ম সমালোচনার এক অপরিহার্য তাগিদ একথাই বার বার ডেকে বলছে। শহীদি রক্তে শিক্ত খুলনায় এ উর্বর জমীন। যে জমীনকে শহীদ হালিম, রহমত, বিমান, আমান তাদের প্রিয় জীবন নিড়ানো তাজা খুন ঢেলে রক্তাক্ত করেছে। এখনো যেখানের তাজা রক্ত শুখায়নি। রক্তাভ লেগে আছে সবুজ ঘাশের আশায়। সে শহীদি জনপদের জিম্মাদারী আমরা কি পালন করতে পারছি? শহীদদের স্বপ্নীল সে স্বপ্নকে ধারণ করে শহীদ হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে শহীদদের প্রিয় সাথীদের। সকল ভীরুতা, জড়তাকে পরিহার করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে হবে। আল্লাহ শহীদ হালিম, বিমান, রহমত, আমানের শাহাদাতকে কবুল করুন, আমাদেরকেও শহীদ হওয়ার তীব্রবাসনা নিয়ে শহীদদের অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার তৌফিক দিন। আমীন!

www.pathagar.com

২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি

মিসেস নাসিমা খাতুন

আমি বিমানের বড় বোন। অনেক কিছু মনে হয় । জানি না সব কিছু লিখতে পারবো কিনা। শরীরের শক্তি এবং মনের বল সব কিছুই কেমন যেন এলোমোলো হয়ে গেছে। তারাবী নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া সেরে বিমানের রুমে শুয়ে ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ঘুম পড়াচ্ছিলাম এরই মধ্যে টিপু এসে সংবাদ দিল আপা দাদা হাসপাতালে। সংবাদ শুনে বললাম, ও বেঁচে আছে? টিপু উত্তর দিল, হ্যাঁ তেমন কিছুই হয় নাই । টিপুর সংগে যেয়ে দেখি বিমান অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের জরুরী বিভাগে । ধরতে গেলাম, কিন্তু ধরতে আমাকে দেওয়া হলো না। ওর শরীরের প্রতিটা আঘাত মনে হচ্ছিল আমার শরীরের ভিতরে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকবে সেই আশায় নিজেকে সংযত করে রাখলাম । রাত্র দশটার সময় বাসায় যেয়ে নামাজ পড়ে যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলাম তখন মোনাজাতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অন্য একটা কথা। তখন মোনাজাত ছেড়ে হাসপাতালে যাই। যেয়ে দেখি বিমানের রক্ত লাগবে। দৌড়ে গেলাম রক্ত পরীক্ষা করাতে কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, রক্ত মিললো না। চলে এলাম নীচে। এসে দেখি ব্যান্ডেজ রক্ত মানছে না। তখনও মনে করি নাই যে এত সহজেই ও ইহ জগত ত্যাগ করবে। হাসপাতালের ডাক্তারা যে এত ভাল ব্যাবহার করতে পারে তা জানতাম না। অনেক বিরক্ত করে ছিলাম ডাক্তারদের কিন্তু উনারা কোন রকম খারাপ ব্যাবহার করলেন না। রাত্র ১২ টা ৫ মিনিটে বিমান আমাদের সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিল । অনেক পাগলামী করেছি। কিন্ত এখন আর না। কারন যখন বুঝতে পারি তার মৃত্যু এভাবেই আছে পৃথিবীর সব শক্তি একত্রিত হলেও বিমানকে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারতো না। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন আর মুত্যকে ভয় করা উচিৎ নয়। তবে বিমানের মৃত্যু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এরকম মৃত্য শুধু কামনা করলেই হয়না। আমাদের সকলের দোয়া করা উচিত আল্লাহ তায়ালা যেন বিমানের শাহাদাত কবুল করেন। আমরা যেন বিমানের রক্তের বদলা ইসলাম কায়েমের মধ্যে দিয়ে নিতে পারি। আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ বিমানের জন্যে একটু দোয়া করবেন। আমি আর লিখতে পারছিনা। সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শেষ করছি।

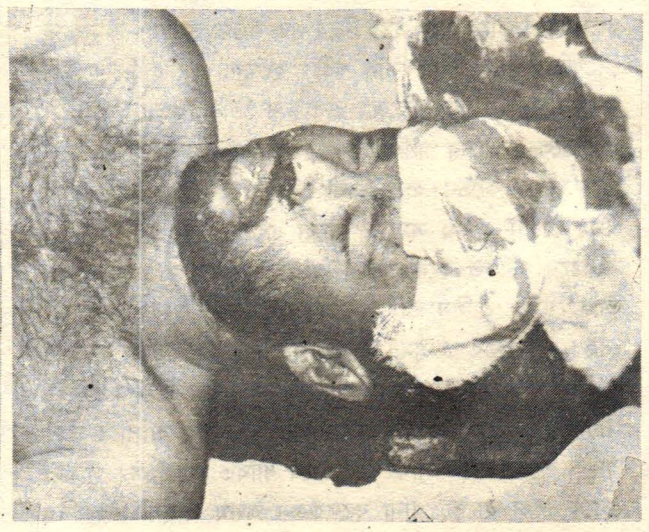

www.pathagar.com

এ স্মৃতি ভুলবার নয়

শেখ আবদুল ওয়াদুদ

"আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ আমান লিখে রেখো।" শাহাদতের পূর্ব মুহূর্তে সাথীদের প্রতি এ মহান আহবান ছিল এতিম আমানের । ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা। সিটি কলেজে ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্তৃক আটকেপড়া শিবির নেতা ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ও আবুল কাশেম পাঠানকে মুক্ত করে আনা হয়েছে। জামায়াত অফিসে সকলে বসা। হঠাৎ খবর এলো আলীয়া মাদ্রাসায় হামলা হয়েছে, শাহাদৎ বরন করেছেন একজন। ছুটে গেলাম আলীয়া মাদ্রাসায়।

এতিম ছেলেরা দৌড়িয়ে এলো। গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, এখন এসে কি হবে, এই যে আমানের লাশ। আমান আর বেঁচে নেই। সে শহীদ হয়েছে । কেন তাকে মারা হলো? জবাব দিতে পারিনি সেদিন এতিমদের এ প্রশ্নের। প্রচন্ড বেদনায় হতবাক হলাম। কি বলবো শত শত এতিম শিশুদের? কি বলে শান্তনা দেব ওদের?

অফিস কক্ষের সামনে খাটিয়ায় রাখা সাদা কাপড়ে ঢাকা শহীদ আমানের লাশ। তার দেহে রয়েছে চেংগিস ও হালাকুর উত্তরসূরী হিটলারের প্রেতাত্মা মানব রূপী হিংস্র কালসাপ হায়েনাদের একতরফা আক্রমনের সকরুণ চিহ্ন। চেহরায় যেন চমকে উঠছে আল্লাহর নুর। চতুর্দিক আলোকিত হচ্ছে নূরের তাজাল্লিতে। লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চোখে মুখে শোকের ছায়া নিয়ে ছুটে আসা অসংখ্য মানুষ। নির্বাক তাকিয়ে দেখছে শহীদকে। আর্তচিৎকার করতে করতে শহীদের লাশের নিকট লুটিয়ে পড়ছে শহীদের সাথীরা।

পিতা মাতার আদরের ধন আমান বাড়ীতে ফিরতে পারেনি আলেম হয়ে, মানুষ হয়ে । পিতা অত্যন্ত আশা করে বলতো আমার আমান বড় আলেম হবে, হাফেজ হবে। আমাদের মুখ উজ্জল করবে । আমানের পিতা তার মাতাকে বলতো নামাজ পড়ে ছেলের জন্যে দোয়া করো। আমাদের আমান যেন ভালভাবে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সকল স্বপ্ন ভেংগে দিয়ে লাশ হয়ে ফিরলো আমান বিধবা মায়ের কাছে। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনির অন্তর্গত দরগাহপুর গ্রামে জন্ম নেয় আমান। এ গ্রামে মাদ্রাসার পার্শ্বে একটু ভিতরে দঁড়িয়ে আছে গোল পাতার ছাউনি মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট একখানা ঘর। সেখানে বাস করত বিধবা মা, আমান ও তার ছোট ভাই আবদুর রহমান ও বোন রেশমা। আমান যখন ২য় শ্রেণীর ছাত্র তখন তার পিতা মারা যায়। আশৈশব পিতৃহারা আমান বিধবা মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্নেহে লালিত হতে লাগলেন নিজ গ্রাম দরগাহ পুরেই। মায়ের কাছে থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। পরে খুলনা আলীয়ায় ভর্তি হন ৬ষ্ট শ্রেণীতে। শাহাদতের সময় ৮ষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন আমান।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বোর্ডিং সুপারের নিকট থেকে ছুটি নিয়েছে। বাড়ীতে যাবে। মায়ের সাথে দেখা করবে তাই। সবেমাত্র ক্লাস শেষ হয়েছে। মসজিদে নামাজ আদায় করে রুমে এসেছে। সকলেই খাবার গ্রহণে ব্যস্ত। খাওয়া শেষ করতে পারেনি কেউ। এমন সময় ছাত্রদলের এলোপাথাড়ী গুলি ও বোমার মুর্হুমুহু শব্দে সকলেই হতবিহ্বল। ছাত্র শিক্ষক ও এতিমরা প্রাণ ভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে নেমে এলো বিভীষিকা। অনেকেরই খাওয়া হয়নি। পানি ও খেতে পারেনি অনেকে। আমান দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠছিলেন। আমানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হলো কাটা রাইফেল দিয়ে। বুলেট বিদ্ধ হলো আমান । মা বলে এক চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। পিতৃহীন এই ইয়াতিমের একমাত্র সম্বল ও ভরসা ছিল মা। কিন্তু মা বলে চিৎকার হায়েনাদের রক্ত পিপাসু মনকে নরম করতে পারেনি । দ্বিতীয়বার গুলি করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয় শহীদ আমানকে। শাহাদতের পেয়ালায় চুমুক দিল আমান। গাছপালা ও পশুরা নির্বাক তাকিয়ে দেখলো সভ্য যুগের নব্য বর্বরদের মানবতার মুখোশধারী এ যুগের কসাইদের।

লাশ বাড়ীতে পৌছলে শহীদের শোকাহত সাথীরা ভীড় জমাতে থাকে শহীদের বাড়ীতে। কান্নায় ভেংগে পড়ে পড়শীরা। মুষড়ে পড়েন শহীদের বিধবা মা। বোন রেশমা ও ছোট ভাই আবদুর রহমানের গগন বিদারী কান্নায় সবকিছু যেন উলোট পালট হয়ে গেল। মানুষ পশু গাছপালা সকলেই যেন শোকে মুহ্যমান। বিধবা মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন– "আমানের পিতা বড় আশা করত আমান বড় আলেম হবে। আমিও আশা করতাম অনেক কিছু। ওর পিতার মৃত্যর পর ওর দিকে তাকিয়েই আমি বেঁচে আছি। ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম। আমান লেখাপড়া শিখবে। বড় হবে পরিবারের হাল ধরবে। ছোট ভাইকে লেখা পড়া শিখাবে। বাকী জীবন স্বাচ্ছন্দে কাটাবো। সবই যে শেষ হয়ে গেল।

শহীদের মাতার সাথে কথা বলতে যেয়ে আমি আবেগকে ধরে রাখতে পারিনি। শান্তনা আর জবাব সবই হারিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান পিতৃহীন বালক এতিম আমান কষ্ট করে লেখা পড়া করত। নিজের খরচ নিজেকেই যোগাড় করতে হতো। তাই মাদ্রাসার ভকেশনাল ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউটে আসরের নামাজের পর দর্জির কাজ করত। তাতে যা পেত তা দিয়েই তার কোন রকমে চলতো। গ্রামের লোক ও চাচাদের সহযোগিতায় তার পরিবার চলতো।

আমান বৎসরে ২/৩ বার বাড়ীতে যেত। মা আমানকে শাহাদতের পূর্বে মাদ্রাসার এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বিদায় নেবার সময় মা বলেছিলেন, আমান বাইরে যেওনা। রাজনীতি করো না। তুমি মারা গেলে আমি কি করে বাঁচবো। সব শেষ হয়ে যাবে। জবাবে আমান বলেছিল- 'মা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যদি শহীদ হতে হয় তাহলে শহীদ হবো । তুমি শহীদের মা হবে। দোয়া করো।' লাশ বাড়ীতে গেলে মা বললেন- আমি অশিক্ষিত তখন বুঝতে পারিনি আমান কি বলতে চেয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছি আমান শহীদ হতে চেয়েছিল। আমানের লোভ ছিলনা কোন জিনিসের উপর। বিধবা মাকে অযথা বিরক্ত করত না। ভাইবোনদের সাথে তার ব্যাবহার ছিল অমায়িক। টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আমান ছিল বন্ধুদের উত্তম সাথী। শহীদ আমান উল্লাহর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওঃ মোনাওয়ার হোসাইন বললেন, ইয়াতিম আমান আর আমাদের মাঝে নেই। বুলেটের নির্মম আঘাতে শাহাদতের অমীয়সুধা পান করে আমান।

হোষ্টেল সুপার মাওলানা ইকরামুল হক বললেন, আমান ছিল সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। খুব শান্ত শিষ্ট ও অতন্ত অনুগত। দীর্ঘ ৬ বৎসরের মধ্যে তাকে মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও হল সুপার একজন ভাল ছাত্র হিসাবে পেয়েছিল । তার চেহারায় স্বর্গীয় আভা প্রস্ফুটিত হতো। বিবেকবান ঈমানদার প্রতিটি মানুষ এধরনের পৈশাচিক হত্যাকান্ডে ব্যথিত ও মর্মাহত না হয়ে পারে না। আলীয়া মাদ্রসায় লাশের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বেলাল ভাইয়ের সাথে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করছি। খবর এলো বি এল কলেজে হামলা হয়েছে। হালিম ভাই আটকা পড়েছে। সেক্রেটারী ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ভাইকে রেখে তড়িৎ ছুটে গেলাম বি এল কলেজের পার্শ্ববর্তী শ্রমিক কল্যাণ অফিসে। সকলেই কান্নায় ভেংগে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হালিম ভাই ও রহমত ভাই হয়তো আর নেই।

দ্রুত ছুটে এলাম হাসপাতালে। আহতদের ভীড়ে অনেকেই কাতরাচ্ছে। আবার কেউ নীরব ও নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে । জিজ্ঞাসা করলাম হালিম ও রহমত ভাইয়ের কথা। মেঝেতে আঃ রহীম, শফীকুল ইসলাম, হাফিজ, রহমত, মিঠু, দেলোয়ার, মাহফুজ ও মুন্সী আবদুল হালিম ভাই সকলেই পর পর অবস্থান করছেন। নীরব রহমত ভাইয়ের মাথায় হাত রাখলাম। একে একে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হালিম ভায়ের নিকটে গেলাম। স্যালাইন লাগানো । মাথায় ও বুকে হাত রাখতে চমকে উঠলাম। মন্টু ভাইকে বললাম, হালিম ভাই আর নেই। বলতেই মন্টু ভাই কেঁদে ফেললেন। আমিও সামলাতে পারিনি। কিন্তু দায়িত্বশীল হিসাবে সামলিয়ে নিয়ে দ্রুত সরে পড়লাম। কর্মীরা টের পেল। হঠাৎ সকলেই চিৎকার দিয়ে উঠলো হালিম ভাই শহীদ হয়েছে বলে। করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো হাসপাতালে। সকলে নির্বাক তাকিয়ে দেখছে শহীদদের শোকাহত সাথীদের। তারাও বেদনার ভাগী হয়ে চোখের পানি ফেলছে। বেলাল ভাইয়ের ভাগ্নে জুনায়েদের কান্না আমি আজও ভুলতে পারিনি । একে একে অনেকেই এলো। বেলাল ভাই, জাকির ভাই প্রত্যেকেই। কেউ কাউকে ঠেকাতে পারছেনা । গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেংগে পড়ছে সকলেই। এই ভাবে কেটে গেল সন্ধ্যা। শাফায়াত ভাই, শহীদ ভাই, মতিন ভাই, পরোয়ার ভাই, ইলিয়াস ভাই, বেলাল ভাই, সকলেই যেন থমকে গেল। শান্তনা দিতে পারছেনা কেউ কাউকে।

যাই হোক, হালিম ভাইকে একবার দেখলাম। সারা শরীর রামদা আর গুপ্তির কোপে ক্ষত বিক্ষত। কোন কঠিন পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী কেউ যদি হালিম ভাইয়ের ক্ষত বিক্ষত চেহারাকে দেখতো তাহলে তার হৃদয় কেঁপে উঠত । এইভাবে একজন মানুষকে জবাই করা যায়! কাটা যায়?

হালিম ভাই ছিলেন মিষ্ট ভাষী আনুগত্য পরায়ণ সাহসী সংগঠক। কখনও চোখে চোখ রেখে কথা বলতে দেখিনি। পরামর্শ করে কাজ করাই ছিল তার স্বভাব। যাকে নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা তার কুরআন তেলওয়াত ও মুচকি হাসি আজও আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়। শহীদ মুন্সী আবদুল হালিম, রহমত আলী, আমিনুল ইসলাম বিমান ও আমানুল্লাহর শাহাদতের ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি । মনে পড়লে থমকে দাঁড়াই । আজও যেন সেই রমজান মাসের ইফতারীর পরবর্তী সময়- যখন বিমান ভাই সহ অফিসে মুড়ি ও ছোলা খাচ্ছিলাম। আর হামলা হলো ঘাদানিকের পক্ষ থেকে। অথচ আমাদের পানি খাওয়া হয়নি। আঘাতের পর আঘাতে বিমান ভাইয়ের শাহাদতের ঘটনা মনে পড়ে। চেতনা ও অনুভূতিতে নাড়া দেয়। তাহলে এই ভাবেই আমাদের ভাইয়েরা শুধু জীবন দেবে। না আজ আর শোক নয়, শোককে শক্তিতে পরিনত করতে হবে। হত্যার বদলা নিতে হবে হত্যার মাধ্যমে নয়, ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সেই সরল মিষ্টি হাসি আর দেখতে পাব না কোনদিন

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম

সেদিন ছিল বাংলা ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ, নববর্ষ। রাত্রি ১২টার সময় শহীদ তিতুমীর হলের ছাদে বসে আছি। আমরা ৮/১০ জন। বসে আছি একটি নতুন শতাব্দীকে বরণ করে নেয়ার জন্য। চারদিকে পটকার আওয়াজ, আনন্দ, উল্লাস, নিউ মুসলিম হলের দিক থেকে একটি মিছিল এল চামচ দিয়ে থালা পেটাতে পেটাতে। নববর্ষের মিছিল, আমাদেরও অংশগ্রহণের আহবান জানাল। থালা পিটিয়ে আমরা নববর্ষ পালন করতে রাজী হলাম না। ভাবলাম কি করা যায়, ঠিক হল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা আযান দিয়েই আমরা স্বাগত জানাবো নতুন শতাব্দীকে। কিন্তু কে দেবে আযান? যার কণ্ঠ সবকিছু ছাপিয়ে যাবে। তুলবে সুমধুর সুরের মূর্ছনা। হ্যাঁ, একজনই আছেন এমন। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় ভাই শেখ রহমত আলী। আযান দিলেন তিনি হলের ছাদে দাঁড়িয়ে। রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে, থালা বাদকদের স্তব্ধ করে দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আযান। এত ভাল লেগেছিল সে আযান যে, মনে হচ্ছিল জীবনের প্রথম আযান শুনছি। থালা বাদকরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এক সময় কিছুটা হতভম্ব, কিছুটা লজ্জিত হয়ে চলে গেল।

রহমত ভাই বয়সে আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন। অর্থাভাবে কয়েকবছর তার পড়াশুনা বন্ধ থাকায় তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ পরিবেশে আমি ও মিলন ভাই তাকে শেখ সাহেব বলে ডাকতাম। বললাম শেখ সাহেব আজ একটা নতুন সংস্কৃতি জন্ম লাভ করল। জবাবে তিনি মিষ্টি করে হাসলেন, মনে পড়ল হাজী মহসিন হলের উদ্বোধনী দিনটির কথা। সেদিনও হলের প্রথম নামাযের আযান দিতে রহমত ভাইয়ের ডাক পড়েছিল।

আজ রহমত ভাই আমাদের মাঝে নেই। ক্যাম্পাসে বা হলে কোথাও না। পরম করুণাময়ের ডাকে অনন্তের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন চির দিনের জন্য। তাঁকে আর কোনদিন পাব না। কিন্তু তাঁর সাথে সাংগঠনিক জীবনের বেশ কয়েকটি বছরের সুমধুর স্মৃতির রোমন্থন আমৃত্যু করবে অশ্রুসিক্ত।

১৯৯২ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাত্র ১দিন আগে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন সেরে হলে ফিরছিলেন রহমত ভাই। রাত তখন ১২টার বেশী, ক্যাম্পাসে প্রবেশ মাত্র ছাত্রদলের খুনী ফারুক তাঁকে বললোঃ

রহমত তুমি আমার নামে কলেজে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছো।

কলেজে খুনী ফারুকের নারী ঘটিত কেলেংকারী তখন সকলের মুখে মুখে। রহমত ভাই বললেনঃ

– আমি তোমার নামে মিথ্যা বলতে যাব কেন? তুমি ভিপি আর আমি সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী। ফারুক বললঃ

– আমি সব বুঝি। নির্বাচনটা যাক তোমার পায়ের তলার মাটি আমি সরিয়ে দেব।

আমার কাছে প্রচন্ড ক্ষোভের সাথে রহমত ভাই বললেন ফারুকের হুমকীর কথা। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম।

– ধৈর্য্য ধরুন রহমত ভাই। পরাজয় নিশ্চিত জেনে ওরা আবোল তাবোল বকছে।

রহমত ভাইকে সান্ত্বনা দিলেও আমার মনে ঘটনাটা বেশ দাগ কাটে। রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের পর আমার বুঝতে বাকী থাকে না, কেন, কে তাকে হত্যা করেছে।

শাহাদাত এক দূর্লভ সৌভাগ্য। আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দারাই এ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। শহীদ রহমত ভাই ছিলেন আল্লাহর এক উচ্চ মর্যাদার সৈনিক। মাত্র ৫ বছর বয়স থেকে তিনি নিয়মিত রোজা রাখা ও নামায আদায় শুরু করেন। শাহাদাত পর্যন্ত তিনি কোনদিন রোজা কাযা করেননি। তিতুমীর হলের নিয়মিত মুয়াজ্জিন ছিলেন তিনি। দারুণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁকে লেখাপড়া চালাতে হয়েছে। বছরের পর বছর তিনি চিংড়ী ঘের পাহারা দিয়ে কাটিয়েছেন। পড়াশুনা এ সময় বন্ধ ছিল। কিছু অর্থ জমা করে আবার শুরু করেছেন। এভাবেই এসএসসি পাশ করেন। আসেন খুলনায়। লজিং থেকে বিএল কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। সংগঠনের সাথেও নিবিড়ভাবে যুক্ত হন এসময়। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে তিনি সাথী হন। শাহাদাতের মাত্র ১৫দিন আগে সদস্য প্রার্থী হন। এ সময় তিনি এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। যদিও তাঁর মানোন্নয়ন ঘটেছিল ধীর গতিতে তবুও দায়িত্বশীলতার উন্মেষ তাঁর মধ্যে হয়েছিল কর্মী থাকা অবস্থায়। যখনই যে দায়িত্ব দেয়া হত তা পালনের জন্য পাগলের মত ছুটতেন। রহমত ভাই বলতেনঃ

– আমি পারি না এমন কোন কাজ নেই। শুধু একটু বুঝিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ক্লাস কমিটি করার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ পারদর্শীতা ছিল। যে সকল শ্রেণীতে কমিটি করা কঠিন ছিল সেগুলোর দায়িত্ব থাকত তাঁর। একবার দর্শন প্রথম বর্ষে

www.pathagar.com

কমিটি করতে গেলাম রহমত ভাইয়ের সাথে। দেখা গেল কোন মুসলমান ছাত্র ক্লাসে নেই কুরআন তেলাওয়াত করলেন অন্য শ্রেণীর একজন ছাত্র। ভাবলাম কমিটি আজ করা যাবে না। রহমত ভাই বললেনঃ

– রহিম ভাই ৩০ মিঃ লম্বা একটা বক্তৃতা দেন। বললামঃ

– তারপর?

– কমিটি ঘোষণা করা হবে।

শুরু করলাম বক্তৃতা। ৩০ মিঃ পর বক্তৃতা শেষ করতেই তিনি একটি কাগজ হাতে দিলেন। পূর্ণাঙ্গ ক্লাস কমিটি। কমিটিতে বেশ কয়েকজন মুসলমান ছাত্রেরও নাম দেখতে পেলাম। পরে জানতে চাইলাম কি ভাবে কি করলেন। জবাবে সরল মিষ্টি হাসলেন। যার অর্থ আমার জানা। তা হলঃ "এটা কোন কঠিন কাজ হল?" প্রতি বছর ৭/৮টি ক্লাস কমিটি তিনি একা করতেন।

সংসদে তিনি দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সহ-ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদক। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজে প্রথমবারের মত আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর বিএল কলেজ হয় চ্যাম্পিয়ন। কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বিভাগীয় শিক্ষকদের বাসায় মাছ কিনে নিয়ে তিনি বেড়াতে যেতেন। বাড়ী থেকে মাছ আনলে রান্না করে শিক্ষক কর্মচারীদের বাসায় দিয়ে আসতেন। এক ঈদে দেখলাম তিনি ২ টি পাঞ্জাবী কিনেছেন। বললাম, অন্যটি কার? জানালেন কলেজের একদরিদ্র অফিস কর্মচারীকে ঈদ উপহার দেবেন ওটা। তাঁর রুমে মাঝে মাঝে কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দেখতাম। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেতেন। একদিন একজন কর্চারীকে জিজ্ঞেস করলাম, রহমত ভাইয়ের রুমে কেন যান? বললেনঃ

– আমি রহমত ভাইয়ের কাছ থেকে প্রতিমাসের মাঝামাঝি টাকা ঋণ নেই। আবার মাসের প্রথমে বেতন পেয়ে শোধ করে দেই।

যদিও নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না তবুও তিনি পরোপকারে কখনও পিছনে থাকতেন না। রহমত ভাইয়ের সাথে একরুমে প্রায় দুই বছর ছিলাম। তিনি রুমে রান্না করে খেতেন। কোনদিন আমাকে রান্না করতে দিতেন না। কোন কাজই আমাকে করতে দিতেন না। রুমে গেস্ট এলে নিজের সিটে রেখে নিজে মসজিদে ঘুমাতেন। বাড়ী থেকে বস্তাভরে চাউল আনতে। তিনি বাড়ী গেলে আমরা তা খেতাম। কোনদিন তার দাম শোধ করতে পারিনি।

শহীদ তিতুমীর হলে শিবিরের সিট সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁর রয়েছে অসামান্য অবদান। প্রতিবছর যে সিটগুলো খালি হত খালি হওয়ার ৬ মাস আগেই তিনি লাগতেন তার পিছনে। এক্ষেত্রে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করতেন। তাঁর কৌশলের সফলতা আজকের তিতুমীর হল। কখনও কখনও তিনি কয়েক বছর একটি সিটের পিছনে লেগে থাকনে। সিট হাতে এনে তবে শান্ত হতেন। কলেজে কোন টেনশান হলেই রহমত ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পড়ত। তিনি রাতের পর রাত জেগে থেকে হল পাহারা দিতেন। রাতের বেলা দায়িত্ব পালনে অনেকেরই আপত্তি থাকত। রহমত ভাই কখনও তা করতেন না। কখনও আমিও থাকতাম তাঁর সাথে, বসতাম কোন গাছের গোড়ায়। গভীর রাত্রে মাত্র দুইজন। নানা কথা বলতেন। আমি বলতামঃ

– রহমত ভাই একটা গান শোনান। রহমত ভাই গাইতেনঃ

"মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি কি তুই আগে"... কখনও গাইছেনঃ

"মধুর চেয়েও মধুর আরও মোহাম্মদের নাম, আমার ...।"

রহমত ভাইয়ের সুর ছিল চমৎকার। বেশ লাগত শুনতে।

নিজ গ্রামে তিনি ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তার মধ্যে একজন মেম্বারও ছিলেন একবার এসে আমাকে বললেনঃ

– রহমতকে আমরা চেয়ারমান নির্বাচন করতে চাই। আমি বললামঃ

– পাস করবে তো! তাঁরা বললেনঃ

– আপনারা অনুমতি দেন। পাস করানোর দায়িত্ব আমাদের। আমি বললামঃ

– আগে এম, এ পাস করুক। তারপর চেয়ারম্যান পাশ করবে।

তাঁরা চলে গেলেন। হয়ত আশা করেছিলেন এমএ পাশ করে রহমত গ্রামে এল তাঁরা একজন যোগ্য নেতা পাবেন। কিন্তু ঘাতক ছাত্রদল সে আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

২০ সেপ্টেম্বর তিনি খুনীদের গুলী বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় খালি হাতে। ইট পাথর দিয়ে জবাব দিচ্ছিলেন ককটেল আর গুলীর। এক সময় তাও শেষ হয়ে গেলে। নির্দেশ পেয়ে হলে চলে এলেন। ততক্ষণে হল খালি হয়ে গেছে। তারপরও কেউ রয়ে গেল কিনা দেখতে দোতলায় গেলেন। আর নামতে পারলেন না সেখান থেকে। হলের বাথরুমে খুনী ফারুক, হাফিজ, আজাদ, লিটন, সোহাগ তাকে ঘিরে ধরে। রামদা আর চাইনিজ কুড়ালের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। প্রতিটি আঘাতের জবাব তিনি দেন "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি তুলে। রক্তে বাথরুম সয়লাব হয়ে যায়। অচেতন হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর অচেতন দেহ রক্তের মধ্যে ভাসছিল। এসময় খুনীরা মাত্র ১ গজ দূর থেকে তাঁকে পাইপ গানের গুলী করে। সারা দেহে সেগুলী বিদ্ধ হয়। তারপর নরপশু আজাদ গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে চলে লাশ গুম করার জন্য। যেন কোনদিন

www.pathagar.com

রহমত ভাইকে আমরা খুঁজে না পাই। তিতুমীর হল থেকে কলাভবন পর্যন্ত রহমত ভাইয়ের অচেতন দেহ টেনে নেয় আজাদ। তাঁর দেহ থেকে রক্তঝরছিল গলগল করে। জানালা থেকে এ দৃশ্য দেখে একজন স্যারের স্ত্রী বেহুশ হয়ে পড়েন। আশেপাশের জানালা থেকে যারাই দেখছিলেন তারাই জানালা বন্ধ করে কাঁদতে থাকেন। বাইরে লোকের ভিড় দেখে খুনী আজাদ আবার রহমত ভাইকে টেনে নিয়ে যায় হলের ভিতরে। এরপর খুনীরা পুলিশের সামনে দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে দৌলতপুর চলে যায়। ফারুক আর হাফিজ মিষ্টি খাওয়ার জন্য পশুপত্তি ঘোষ ডেয়ারীতে যায়। হাফিজ বললঃ

– আমার মিষ্টি খাওয়া হালিমের জন্য। ও আমাকে নির্বাচনে হারিয়েছে। ফারুক ভাই আপনারটা কার জন্য? ফারুক বললঃ

– রহমতের জন্য। আমি ওর পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছি আজ। ওর জন্য হেরেছি আমি।

রহমত ভাইকে বাঁচানোর সকল চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি তো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন অনেক আগে। তাই কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে চলে গেলেন জান্নাতের পানে। সর্বশেষ অচেতন হওয়ার আগে তিনি পড়লেনঃ

"ওয়ালা তাকুলু লি মাইয়্যুক তালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। বাল আহইয়ায়ূ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন– যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের মৃত বল না। তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।"

২ অক্টোবর রহমত ভাইয়ের শাহাদাতের খবর হল খুলনায়। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র নয়ন জামায়াত অফিসে কেঁদে জড়িয়ে ধরল আমাদের। ৩ তারিখ কাশিপুর মসজিদে আসরের নামায শেষে একজন অভিভাবক হাত ধরে কেঁদে বললেনঃ আমার বাড়ী একটু চলেন।

জিজ্ঞেস করলামঃ কেন? বললেনঃ আপনার ভাবী আর আমার বাচ্চা দুটো আজ ২ দিন কিছু খাচ্ছে না। ওরা কেবল কেঁদেই চলেছে।

জানলাম একসময় ও বাড়ীতে রহমত ভাই লজিং ছিলেন। কান্নার অজস্র ধারা সেদিন সিক্ত করেছিল খুলনার জমিন। কিন্তু শুধুই কি কান্না ছিল? না। হাজার যুবক দ্বীনের ঝান্ডা বহনের জন্য শপথ নিয়েছিল সেদিন। ইসলামের জন্য শহীদ হওয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল।

চোখ বুজলেই রহমত ভাইকে দেখি। তাকে হারিয়েছি চিরদিনের জন্য। তার সরল মিষ্টি হাসি আর দেখতে পাব না কোনদিন।

অন্তিম শয়ানে শহীদ রহমত আলী

www.pathagar.com

২০ সেপ্টেম্বর খুন ঝরা সেই দিনটি

মাকসুদুর রহমান মিলন

প্রলয়ংকরী ঝড় আর বজ্র যদি ফুলে ফুলে সুশোভিত একটি সাজানো বাগানে উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকে তাহলে মুহূর্তেই ফুলের পাপড়িরা যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধুলিতে গড়াগড়ি যায়, স্বর্ণালী ডানার পাখিরা যখন ঝলসানো কাবাব হয়ে ছিটকে পড়ে মাটিতে, বন্ধ হয়ে যায় তাদের সুললিত কণ্ঠের গান, ২০শে সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক ছোবল ঠিক একই ভাবে হাজারো ছাত্রছাত্রীর তারুন্যদীপ্ত পদচারনায় মুখরিত বি এল কলেজের পরিবেশকে বিধ্বস্ত ও ক্ষত বিক্ষত করে পরিনত করে একটি সাক্ষাৎ ধ্বংসস্তুপে। সেখানকার সদা হাস্যোজ্জল মুখগুলো আজ স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর। প্রতিটি প্রাণই আশংকিত সন্ত্রাসীরা আবার না জানি কখন নারকীয় তান্ডবতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে এখানকার শান্তি প্রিয় শিক্ষার্থীদের উপর। একই পরিবেশ বিরাজ করছে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান খুলনা আলিয়া মাদ্রাসাতেও।

গতবছর ২০ শে সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন বি এন পির মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও তাদের দোসররা সারা মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোকে সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিনত করে। সন্ত্রাসীরা বি এল কলেজ ছাত্র সংসদের জি. এস এবং শিবিরের কলেজ সভাপতি মুন্সী আব্দুল হালিম, সাহিত্য সম্পাদক ও ক্যাম্পাস সেক্রেটারী শেখ রহমত আলী এবং খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার ইয়াতীম ছাত্র আমানুল্লাহ আমানকে প্রকাশ্য দিবালোকে বর্বরোচিত ভাবে খুন করে হত্যা ও সন্ত্রাসের এক কলংকজনক অধ্যায় রচনা করে। সন্ত্রাসের শিকার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পাঠক সমাজের কাছে আমরা ঘটনার বিস্তারিত বিবরন তুলে ধরা কর্তব্য মনে করি। ঘটনার আবেগহীন বর্ণনাই প্রমান করবে কত জঘন্য ছিল খুনীদের খুন পিপাসা। পক্ষান্তরে সত্য ও ন্যায়ের ফর্মাবরদার শিবির কর্মীরা কতখানি উজ্জীবিত ছিল শাহাদাতের তামান্নায়।

খুনীদের নরক গুলজার করা তান্ডব ২০ শে সেপ্টেম্বর দুপুরে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও ১৯ তারিখ সন্ধ্যায়ই তাদের অপতৎপরতার সূত্রপাত ঘটে। ঐ দিন সন্ধ্যায় ছাত্রদল ও মৈত্রীর সন্ত্রাসীরা শিবির নেতা ও দৌলতপুর কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি, এস কামরুল ইসলাম এবং বি, এল কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সদস্য আব্দুল মোমেনের উপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা হাতুড়ী এবং ইট দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং আঙ্গুল দিয়ে চোখ তুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন হুইপ আশরাফ মাত্র ১০০ গজ দুরে বি, এল কলেজের যায়গায় অবৈধ ভাবে নির্মিত বি, এন, পি অফিসে অবস্থান করছিল। হামলা শেষ করে সন্ত্রাসীরা বি, এন,পি অফিসে এলে হুইপ তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস ত্যাগ করে।

২০ শে সেপ্টেম্বর '৯৩ দিনটি অন্যান্য দিনের মতই শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের সমাগম ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তারপরও অফিসের কাজে যারা এসেছিলেন তারাও দুপুর দেড়টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা এবং হাতে গোনা কয়েকজন পরীক্ষার্থী ছাড়া হোষ্টেলও ছিল প্রায় ফাঁকা। দুপুর আড়াইটার দিকে হলে অবস্থানরত ছাত্ররা কেউ কেউ হলের মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন। কয়েকজন ডাইনিং এ দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি নিজেও ঐ সময় খাবার খাচ্ছিলাম। অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ জি এস মুন্সী আবদুল হালিম তখনও আহারের সুযোগ পাননি। তিনি অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংসদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

শিবিরের মহানগরী কলেজ জোনের পরিচালক ও ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আঃ রহীম ও সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী আহত আবদুল মোমেন এবং কামরুল ইসলাম কে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ করেই খবর আসে ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবদলের আর্মস ক্যাডার সহ ২০০/৩০০ বহিরাগত পেশাদার গুন্ডা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বি এল কলেজ ঘিরে রেখেছে। শহীদ আবদুল হালিম খবর পেয়ে দৌড়ে ছুটে আসেন তিতুমীর হলে। মাত্র ৩৫/৪০ জন

www.pathagar.com

জানবাজ শিবির কর্মীকে তিনি হল মসজিদে সমবেত করে জীবনে শেষ বারের মত হেদায়াত প্রদান করেন।

তিনি এ সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বলেন সন্ত্রসীরা বি এল কলেজ থেকে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। আমাদের জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও বি এল কলেজে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চাই। এ জন্যে যদি কাউকে শাহাদাত বরণ করতে হয় তাহলে জেনে রাখবেন মুন্সী হালিমই হবে প্রথম শহীদ। সমাবেশ শেষ করে শিবির কর্মীরা হল থেকে নীচে নেমে আসেন। ইতিমধ্যেই পেশাদার সন্ত্রসীরা ১ম গেট, ২য় গেট, প্রাইমারী স্কুল গেট, সুবোধচন্দ্র ছাত্রাবাস প্রভৃতি যায়গা থেকে একযোগে বৃষ্টির মতো বোমা ও গুলি বর্ষণ করতে করতে তিতুমীর হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এসময় শিবির কর্মীরা দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে জীবন বাজী রেখে ইট পাথর এবং উদ্যানের বেড়া ভেংগে লাঠি সংগ্রহ করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বোমার স্প্রিন্টার এবং গুলিকে উপেক্ষা করে এমনকি কেউ কেউ আহত হওয়া সত্বেও খালি হাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার আশায় সন্ত্রাসীদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিলেন। এই জানবাজ কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে ২য় এবং প্রাইমারী স্কুলের গেটের সন্ত্রাসীরা পলায়নে বাধ্য হয়। ১ম গেটেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় আরও অধিক সংখ্যক সন্ত্রাসী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ১ম গেটে পুনরায় হামলা চালায়। এখানে সংগঠনের মহানগরী ছাত্রকল্যাণ ও সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পায়ে উপর্যুপরি তিন দফা গুলিবিদ্ধ হয়ে আঁহত হন।

তাকে ধরাধরি করে কলেজ মসজিদে নেয়া হয়। আহত ভাইকে একা ফেলে না গিয়ে হালিম ভাই এবং অপর কর্মী হাফিজুর রহমান মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের আশা ছিল আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ সকলের জন্যে নিরাপদ। অতএব রক্তপিপাসু খুনীরা অন্ততঃ মসজিদে রক্ত ঝরাবেনা। কিন্তু আল্লাহর গোলামদের সে আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে খুনীরা মসজিদের ওপরই ঝাপিয়ে পড়ে। তারা মসজিদের উত্তর দিকের জানালার কাঁচ ভেংগে মসজিদের মধ্যে গুলি ও বোমা বর্ষণ করতে থাকে এবং রামদা দিয়ে জানালার গ্রিল কাটার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে তারা মসজিদের সামনের দিকের বারান্দায় উঠে আসে এবং বোমা মেরে আল্লাহর পবিত্র ঘরের দরজা উড়িয়ে দেয়।

এসময় ক্ষুধার্ত শ্রান্ত ক্লান্ত শহীদ হালিম খুনীদের নিবৃত্ত করার জন্য সর্বশেষ বারের মত চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষরূপী বর্বর পশুরা প্রথমে শিবির কর্মী হাফিজুর রহমানকে পেটে গুলি করে মসজিদের মেঝেতে ফেলে দেয়। তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে মসজিদের মেঝে সয়লাব হয়ে যেতে থাকে। এসময় নরপশুরা বন্দুক, রামদা, গুপ্তি নিয়ে মুন্সী আব্দুল হালিমের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। প্রথমে গুলিবিদ্ধ হালিম ভাই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে রামদা এবং গুপ্তি দিয়ে তাকে নির্মমভাবে আঘাত হানতে থাকে। এসময় তিনি শহীদ হয়েছেন মনে করে পশুরা তাকে মসজিদ থেকে বের করে মসজিদ সম্মুখস্ত পুকুরে নিক্ষেপ করে। পানিতে তার শরীর নড়াচড়া করতে দেখে হিংস্র হায়েনারা তাকে পুকুর থেকে তুলে আনে। এসময় তিনি ইশারায় পানি খেতে চান। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী হালিম ভাইকে এক কাতরা পনি না দিয়ে মসজিদের সামনে ফেলে প্রকাশ্য দিবালোকে কসাইদের পশু জবাইয়ের মত জবাই করে খুনীরা তাদের খুন পিপাসা নিবারণ করে। জবাই করেই ক্ষান্ত হয়নি নরকের কীট খুনীরা, তার হাত এবং গায়ের রগও কেটে দেয়।

খুনের নেশায় উন্মত্ত বি এন পি ও ছাত্রদলের রক্ত লোলুপ পিশাচরা রহমত আলী ভাইকে গুলি করে ফেলে দেয়। তারপর একই কায়দায় রামদা, চায়নিজ কুড়াল এবং গুপ্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে । শহীদ রহমতের শরীরে যখন খুনীরা এক একটি কোপ দিচ্ছিল আল্লাহর খাস গোলাম রহমত ভাই কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার করছিলেন। একপর্যায়ে জাতীয়তাবাদী পশুরা তাকে উপুড় করে ফেলে ঘাড়ের দিক থেকে জবাই করতে থাকে। এতেই তার স্পাইনালকর্ড কেটে যায় এবং সাথে সাথে মর্দে মুজাহিদ রহমত ভাইয়ের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত আল্লাহু আকবার ধ্বনি বন্ধ হয়ে যায়। সারাদেহে ক্ষতবিক্ষত রহমত ভাইকে তারা মৃত মনে করে টেনেহিঁচড়ে বহুদুর পর্যন্ত নিয়ে যায় তার লাশ গুম করার জন্যে । কিন্তু পরে তারা তাকে রাস্তায় উপর ফেলে রেখে যায়।

সন্ত্রাসীরা এরপর গুলি করতে করতে হল সমূহে হামলা চালায়। তারা শিবির কর্মীদর কক্ষগুলোতে ব্যাপক লুটতরাজ চালায় এবং বিছানা ও বইপত্র একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ ধরে তান্ডব চালিয়ে তারা হলগুলোকে ধ্বংসস্তুপে পরিনত করে। ঘটনায় শিবির নেতা আবদুর রহিম মাসুদুর রহমান মিলন, মাহফুজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, মেহেদী মাসুদ, তৈয়বুর রহমান তোতা, মিঠু, দেলোয়ার, আবদুল খায়ের লস্কর, হারুন আর রশিদ, রেজাউল ইসলাম রেজাসহ ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত শিবিরের সকল নেতা কর্মী আহত হন।

বিকাল ৪-৫৫ মিনিটে মুন্সী আবদুল হালিম শাহাদাতের অমীয় পেয়ালা পান করে তার রবের কাছে পৌঁছে যান। মুমূর্ষ শেখ রহমত আলীকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তিন দিন পরে চিকিৎসার জন্যে ঢাকা গেলে তার সংগে দেখা হয়। তখন তার কথা বলা এবং চোখে পলক ফেল ছাড়া সকল শরীরই অবশ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররাও তার আশা ছেড়ে দিয়ে বলছেন, তার মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় রহমত ভাইয়ের সংগে দেখা হলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে যে কথাটি বললেন তা হলো, আমি আপনাকে সেফ করার জন্যে আপনার পিছনে পিছনেই তো যাচ্ছিলাম। আমার কথা না শুনে ওদিকে কেন গেলেন? আমার কথা শুনে চললে তো আর এভাবে গুলি খেতে হতোনা।

কত বড় মনের অধিকারী হলে একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ এভাবে অপরকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী শিবির নেতা শেখ রহমত আলী ভাই তার বিধবা মা সহ হাজারো শুভানুধ্যায়ীকে কাঁদিয়ে তার রফিকেআ'লার ডাকে সাড়া দিয়ে ২রা অক্টোবর জান্নাতের পথে পাড়ি জমান। ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সরকারী বি এল কলেজে এই নারকীয় সন্ত্রাসে নেতৃত্বে প্রদান করে ছাত্রদলের খুলনা নগর কমিটির সম্পাদক আজাদ, বি এল কলেজের ফারুক, হাফিজ, মোস্তাফিজ, লিটন, হায়াত, দৌলতপুরের পেশাদার খুনী কামাল, খোকন, ইকবাল সহ ছাত্রদল, যুবদলের বহু সংখ্যক সশস্ত্র ক্যাডার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল বি এন পি এবং তার অংগ দলগুলি ২০শে সেপ্টেম্বর মহানগরীর প্রায় সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। জোহর নামাজ শেষে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার এতিমখানার ছাত্ররা যখন আহার করছিল তখন ছাত্রদলের খুনীরা মাদ্রাসায় হামলা চালায়। হামলায় ৯ম শ্রেণীর ইয়াতীম ছাত্র ও শিবির কর্মী আমানুল্লাহ শাহাদাত বরন করেন। একই দিন বেলা ১১ টায় ছাত্রদলের খুনীরা খুলনা এম এম সিটি কলেজ, আযম খান কমার্স কলেজ এবং ফুলতলা কলেজেও পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে হামলা চালায়।

ছাত্রদলের খুনীরা এই বর্বরতা চালানো ও এই হত্যাকান্ডের নাটের গুরু ছিল স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, হুইপ আশরাফ, মেয়র তৈয়বুর রহমান এবং নগর বি এন পি সম্পাদক নজরুল ইসলাম মন্টু। এরা ১৯শে সেপ্টেম্বর খুলনা মহানগরীর স্মরণকালের সর্ববৃহৎ নরাধমদের হোতা বি এন পি ও ছাত্রদলের খুনীরা আজও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। হুমকী দেয় আরও রক্ত ঝরানোর । কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। বি এল কলেজের হত্যাকান্ডের সময় মাত্র ১৫০ গজ দুরে দাঁড়িয়ে পুলিশ এই তান্ডব প্রত্যক্ষে করে।

পরবর্তীতে মামলা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। উপরন্তু শিবির কর্মীদের উপর নির্যতনের মাত্রা বেড়েছে বহুগুণ। বিচারের বাণী আজ কাঁদছে নীরবে নিভৃতে। কিন্তু একথা তো সত্য যে, রাতের অমানিশা যত গভীর হয় স্বর্নালী অরুনোদয়ও হয় তত ত্বরান্বিত। আমাদের শহীদরাও সেই স্বর্নালী ভোরের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। যা সারা দুনিয়ার বিভ্রান্ত মানবতাকে দেখাবে সিরাতুল মুস্তাকিম। শহীদদের এ স্বপ্নেই আজ পরিনত হয়েছে অসংখ্য শিবির কর্মীর চিরন্তন আকাংখায় আর তাইতো রক্ত সাগরের কিনারে দাঁড়িয়ে সবাই অপেক্ষমান একটি রক্তাক্ত সুর্যোদয়ের- যে সূর্য আকাশে পৌঁছে গেলেও তা থেকে আগুনের হলকা বিচ্ছুরিত হবেনা বরং চুইয়ে চুইয়ে শুধু খুন ঝরবে! অসংখ্য শহীদের উষ্ণ তাজা খুন।

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বোলোনা প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত।"

— আল-কুরআন

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

ব. ম. মনিরুল ইসলাম

ডাগর ডাগর চোখ। গোলগাল শক্ত মুখমন্ডল আর পুরুষ্ট শরীর। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার কুচকুচে কালো ছোট ছোট শ্মশ্রুরাজি। উজ্জ্বল চকচকে চোখদুটো তখনও কি যেন খুঁজে ফিরছিল। গায়ে তার হাফ শার্ট না গেঞ্জি এতদিন পরে তা মনে নেই। প্রথম সাক্ষাতে এবং কথাতে তিনি আমাদের আল হেরা মসজিদ দেখিয়ে দিলেন। পরে জেনেছিলাম তিনি শিবিরের অতন্দ্র প্রহরী সাথী। নাম জেনেছিলাম আমিনুল ইসলাম বিমান। বিমান নামটা শুনে মনে মনে বেশ হাসিও পেয়েছিল। এ আবার মানুষের কেমন নাম- বিমান। একটু Uncommon, সবার সাধ থাকে বিমান চালাবে, বিমানে চড়বে। এ বিমান কিন্তু সে বিমান নয়। এ বিমান মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে চলে গেছে সর্ব শ্রেষ্ঠ বন্দরে। দীর্ঘদিন প্রায় ২ বছর তার নামটা মনে ছিল। সেকি তার Uncommon নামের কারণে না চোখ মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে- তা বলতে পারব না। ৯০-এর শেষের দশকে খুলনায় আসলাম পড়াশুনা করতে। বয়রাতে স্থান হল। একেবারে তার বাড়ীর পাশেই। বাহ! এ যে সেই বিমান ভাই। যাক একজন সাংগঠনিক বন্ধু পেলাম। কিন্তু উভয়ের রিকসা বিপরীতমূখী হওয়ার কারণে কথা হল না।

দু'দিন পরে নূরনগর স্কুলে S.S.C কৃতী ছাত্রদের সম্বর্ধনা, ভালভাবে পরিচিত হলাম বিমান ভাইয়ের সাথে। শুরু হল বন্ধুত্ব পরে ভ্রাতৃত্ব। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁর উপশাখার বায়তুলমাল সম্পাদকের, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে Transfer করা হল অন্য উপশাখায়। তারপরও সব সময় দেখা হতো, কথা হতো; মতবিনিময় হতো। বিকাল ৩টা গড়িয়ে গেছে- দেখতাম বিমান ভাই এক বালতি কাপড় নিয়ে পুকুরে হাজির। কি বিমান ভাই এখন কাপড় কাঁচবেন? ছোট্ট উত্তর বাইরে একটু কাজ ছিল। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিমান ভাইদের বাড়ীতে যেতাম। বুঝতে পারতাম না এটা ভবিষ্যতে শহীদের বাড়ী হবে। ছাত্র সংবাদ, কিশোর কণ্ঠ, নিউজলেটার তার টেবিলে থাকত। বর্ষার দিনে বিমান ভাইদের বাড়ীতে ঢোকার পথে খুব কাদা হত। একেবারে গেঁয়ো কাদা যাকে বলে। বিমান ভাই তখন আমাকে সাবধানে আসার জন্য বলতেন। বিমান ভাই রাগ করতেন কিন্তু সে রাগ বেশীক্ষণ থাকত না। বিমান ভাই এর অট্টহাসি কখনও শুনিনি। যখন তিনি মুচকি হাসতেন তখন সত্যিই সে হাসি দেখতে ইচ্ছা হত। একবার এক ওয়ালরাইটিংয়ে আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যেতে পারিনি। পরের দিন তিনি আমাকে শুনিয়ে সালাম ভাইকে বললেন রাত্রে একজনের আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি কেন জানি আসেননি। তখন আমি লজ্জিত হলাম। আমার ঈর্ষা ছিল বিমান ভাইয়ের সাইকেলটা নিয়ে। কারণ সাইকেলটা পুরানো হলেও তিনি খুবযত্ন করতেন এবং সাইকেলটা ছিল খুব চালু। অথচ আমার সাইকেলটা অত চালু ছিল না। দূর্ভাগ্য যে ৯১ সংসদ নির্বাচনের সময় যখন আব্বাস আলী খান খুলনায় আসেন তখন সাইকেলটা চুরি হয়ে যায়। কিন্তু তিনি এ নিয়ে মোটেই বাড়াবাড়ি করেননি। বিমান ভাইয়ের সাথে আমার মাঝে মাঝে একটু রাগারাগি হতো। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। একবার থানার একসাথী বৈঠকে বিমান ভাইয়ের আসতে দেরী হয়েছিল। দেরী হওয়ার কারণ হচ্ছে বিমান ভাই বিএল কলেজে একটা ছেলেকে ভর্তি করার ব্যাপার নিয়ে। আমি বলেছিলাম বিমান ভাই সামাজিক কাজ একটু বেশী করেন তো। তাই বিমান ভাই প্রতিউত্তরে বলেছিলেন তাদের জন্যও তো কাজ করতে হবে। এমন ছিল বিমান ভাইয়েব উদার মন। নিজের বাড়ীর আশেপাশের এলাকার পরিবেশ কাজের অনুকূল ছিল না বলে তিনি কাজ করতেন সিএন্ডবি এলাকায়। থাকতেন বেশী ওখানেই। কারো কোন কাজ করতে হলে যদি নিজের টাকাও যেত তিনি তা নিঃস্বার্থ ভাবে করতেন। কখনও কখনও বিমান ভাইকে দেখতাম রাত ১২/১টার দিকে বাসায় যেতে। জিজ্ঞেস করতাম এত রাত হল যে, বলতেন, কি করব একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম, ছাড়াতে একটু দেরী হয়েছে। এইভাবে তিনি বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ঝামেলার সমাধান করতেন। সিএন্ডবি নূর নগর এলাকায় এমন কেউ ছিল না যে বিমান ভাইকে চিনত না। তার ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নূরনগর বিশ্বাস পাড়ায় তার ব্যক্তিত্বের কারণে এক বিবাহের আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। সেদিন দেখেছি বিমান ভাই কত সামাজিক। বলতে গেলে তারই পরিচালনায় বিয়ের আপ্যায়নটা আনন্দঘন হয়েছিল। সংসদ নির্বাচনে তারই পরিচালনায় এবং প্রায় এককভাবে তারই আর্থিক সহযোগিতায় যুবক ভাইদের নিয়ে চা চক্র অনুষ্ঠানটা সুন্দর হয়েছিল। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরেও বিমান ভাই কখনও জাঁকজমক পোশাক পরতেন না। একবার বিএল কলেজে নির্বাচনের সময় এক কর্মী বিমান ভাইকে বলেছিল, কলেজের বেতন পরিশোধ না করলে সে ভোট দিতে পারবে না। পরোপকারী বিমান ভাই তার সমুদয় বেতন পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে বিমান ভাইয়ের কৃতিত্ব উল্লেখ করতে গেলে আদৌ শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

১৯৯১-৯২ সেশনে বিমান ভাই এর দায়িত্ব আসল বিএল কলেজে এবং আমি চলে আসলাম পশ্চিম থানায়। যদিও স্থান পরিবর্তন হল কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিবর্তন হল না। বিমান ভাই, আরিফ ভাই বিএ পাশ করল এবং ইয়াছিন ভাই পাশ করল পলিটেকনিকের সর্বচ্চো ডিগ্রী। সেই সুবাদে বয়রার একটা মসজিদে এশার নামাযের পর একটা আনন্দ ঘন পরিবেশে চললো মিষ্টি খাওয়ার অনুষ্ঠান। আজ আমাদের মাঝে বিমান ভাই নেই, ইয়াছিন ভাই নেই কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে থাকবো ততদিন মনে হয় সেই স্মৃতি মনে বেদনা দিবে। শহীদ তারাই হয় যাদের আল্লাহ বাছাই করে নেন। সংগঠনের সাথীর কাজ হচ্ছে সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কিন্তু বিমান ভাই সংগঠনকে জীবনের একমাত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সংগঠনের এমন কোন কাজ হতনা যেখানে বিমান ভাই থাকতো না। সর্বত্র বিমান ভাইকে হাসি মুখে পাওয়া যেত। বিমান ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার কর্ম চঞ্চল জীবন আমাদের মাঝে আছে। তিনি শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেও আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিমান ভাই আজকে জান্নাতে অবস্থান করছেন। আমরাও যেন তার মাড়িয়ে চলা সিঁড়ি বেয়ে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌছাতে পারি।

www.pathagar.com

চির চেনা চির জানা
শহীদ হালিম, শহীদ রহমত

মোহাম্মদ মাসুদ আলম গোলদার

শহীদ হালিম, শহীদ রহমত ভাই সম্পর্কে কখনো লিখতে হবে তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। আজ আমার প্রিয় সাথীদের সম্পর্কে লিখতে বসে মনে পড়ছে তাদের অনেক দিনের অনেক স্মৃতিকথা, ঈমানের যে বিরাট দীপ্ত সূর্য্য নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই ধরাধামে। আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন আলোর মশালবাহী হয়ে থাকতে। তারা একদিন আমাদের শত সহস্র হৃদয়ের অজস্র রক্ত ক্ষরণের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় আলোর পথের দিশা দিয়ে হঠাৎ করে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাবে সেকথা কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে হালিম ও রহমতেরা সংখ্যায় বেশী জন্মগ্রহণ করে না। মহাকাশে ধুমকেতু যেমন মানব সমাজেও তেমনি তারা জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র কর্মময় কতকগুলো অবিনশ্বর মুহূর্ত নিয়ে। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবদুল মালেকের কথায় এ মহাজীবনের পরিচয় মেলে "জীবন মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসছি, কিন্তু এই অখন্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিৎ দু'একটি জীবনের সন্ধান মিলে যা সর্ববিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র" মহত্বে জ্ঞানে কর্মে সে জীবন হয়ে উঠে আমাদের আদর্শ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত রহমত সঞ্চিত হয়ে সে আদর্শ জীবন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ হালিম ও শহীদ রহমত আলী। শহীদ হালিম ছিলেন কর্মীদের কাছে একটি আদর্শ। কর্মীদেরকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাদের দুঃখ ও বেদনার সাথী। সকল কর্মীদের ব্যাপারে তার ছিল পরিষ্কার ধারণা। কর্মীদের কাছে তাই তিনি ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। একজন অভিভাবক, একজন নেতা।" আর কলেজের সাড়ে সাত হাজার ছাত্রছাত্রীর তিনি ছিলেন প্রিয় হালিম ভাই। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র। কর্মচারীদের একান্ত আপনজন। তার ইমামতিতে হাজী মুহসীন হল মসজিদে অসংখ্য বার নামায পড়ার আমার এবং হলের অন্যান্যদের সৌভাগ্য হয়েছে । এমনকি আল্লার এ গোলামের কোরআন তেলাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্বের হলের ছাত্র কর্মচারীরা হাজী মুহসীন হলে ছুটে যেত নামায পড়তে। শহীদ হালিম ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনার সাথে সাথে তার মা বার ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছিলেন। জ্ঞান ফিরলেই শুধু বলছিলেন "আম হালিম তুই একটি বার ফিরে আয়, আমাকে আর একটু কোরআ তেলাওয়াত করে শুনা বাপ।" আমরা যখনই তাদের বাড়ি গিয়েছি হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছেন, "তোমরা এসে আমাকে একটু হালিমের মত কোরআন তেলাওয়াত করে শুনা পার।

কলেজের পদার্থ বিদ্যার একজন শিক্ষক হালিম ভাইয়ে শাহাদাতের পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বার বার বলছিলে ছাত্রজীবনে একই হলের পাশের রুমের মালেককে হারিয়েছি অধ্যাপনা জীবনে আরেক মালেককে হারালাম। কি অদ্ভুত মি খুঁজে পেয়েছিলাম শহীদ মালেক ও শহীদ হালিমের ভিতরে।

শহীদ হালিমের দুইটি শখ ছিল

একঃ শাহাদাতের মৃত্যু, দুইঃ ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠ শাহাদাত যে তার কত কাম্য ছিল তার নিজের ডাইরী লিখেছিলেন তার নিজের ভাষায়।

"যেখানে রয়েছে আমার বড় ভাই শহীদ আবদুল মালেক, শহী সাব্বীর, শহীদ হামিদ, শহীদ আসলাম, শহীদ শফিক, শহীদ অ রহিম, শহীদ লিটন- আমিও তো যেতে চাই- যাবো তাদে ওখানে শহীদি মিছিলে আমিও আসছি। শাহাদাত আমার সক কর্ম প্রেরণার উৎস।"

শহীদ রহমত ভাই ছিলেন ত্যাগী, সদালাপী সদাহাস্যোজ্জল পরোপকারী, সাদাসিদে জীবন যাপন করতে ভালবাসতেন তিনি তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু বিনয়াবনত গোলামের মূ প্রতীক। প্রতিদিন সকালে তার মধুর সুরের আযানে ঘুম ভাং শহীদ তিতুমীর হলের ছাত্রদের। রুমে সর্বদা মেহমানে ভরপু থাকত, মসজিদই ছিল তার প্রিয় ঠিকানা। শহীদ হালিম ভা সর্বদা দু'টি গান গেতেন "আজো সেই কোরআন আছে হাদি আছে সেই ঈমান আর আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামি করে নিও।

গভীর রাতে উঠে মসজিদে যাওয়া, নামায পড়া তার রুটি মাফিক কাজের অংশ ছিল। শহীদ হালিম ভাই ঘুমিয়ে আছে নিজ গ্রাম ফুলতলা ও শহীদ রহমত ভাই ঘুমিয়ে আছে তালাখানার দোহারের নিভৃত পল্লীতে আর শহীদের শত সহ সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, "তোমরা শহীদের সাথী তোমরা আমাদের হত্যার বদলা নিও বাংলাদেশে ইসলাম জীবনাদর্শ আল কোরআনকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

শহীদের প্রেরণা

মুহাম্মদ মোকছেমুল ইসলাম বাপ্পী

াংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ত্মা নিয়ে যে স্রোতটি প্রবাহিত তার নাম বাংলাদেশ ইসলামী ত্র শিবির। একাত্ববাদের চেতনায় লালিত এ সংগঠন। এর জন্ম ১৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। মাত্র সতের বছরের উঠতি শোর এই সংগঠন শৌর্যে ও বীর্যে এক পরিপূর্ণ যুবক হয়ে শের সকল শিক্ষাঙ্গনে সম্প্রতি একক ছাত্র সংগঠন হিসাবে জেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে বহু রুণ প্রাণের তরতাজা শহীদী খুন। রয়েছে ৬৬ টি সম্ভাবনাময় বনের আত্মত্যাগ। শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান ১৯৯২ লের ২৬শে মার্চ (২০ শে রমজান) খুলনা মহানগরীর প্রথম হীদ। তথাকথিত গণ আদালতী আওয়ামী বাকশালী চক্র এবং মপন্থী কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে শিবিরের মহানগরী অফিস ক্ষার জন্যে বিলিয়ে দেন মূল্যবান উজ্জ্বল জীবন। এরপরও থেমে কেনি বিরোধীদের কু-প্রবৃত্তি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণ এবং ত্রদের কাছ থেকে নির্লজ্জ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গত ২০ শে প্টেম্বর '৯৩ বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং খুলনা আলিয়া দ্রাসায় গণতন্ত্রের মুখোশ পরে ঘটায় স্মরণকালের জঘন্যতম ত্যাকান্ড। শহীদ হন মুন্সী আঃ হালিম, শেখ রহমত আলী এবং লিয়া মাদ্রাসার এতিম ছাত্র আমান। তাঁরা এই শহীদী ফেলার যথাক্রমে ৫৮, ৫৯ এবং ৫৭ তম শহীদ। এই ঘটনা নাবাসী তথা সমগ্র বাংলাদেশের সকল বিবেক সম্পন্ন নুষের মনে দিয়েছে প্রচন্ড নাড়া। দেশের মানুষ ধিক্কার নিয়েছে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের। বিচার চেয়ে রাজপথে মেছে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা, এখনোও পুনরাবৃত্তি চলছে এ ত্যালীলার। আরো ৯টি প্রাণ বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে রণত হয়েছে খুণীদের নির্মম নিষ্ঠুর শিকারে।

রত রসুলে করীম (দঃ) বলেন, "প্রত্যেক পূণ্যের ওপরে আরেকটি পূণ্য আছে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার চাইতে আর কোন বড় পূণ্য হতে পারে না।"

একটি হাদীসে দেখা যায় যে, কিয়ামতের দিন্ তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরা হচ্ছেনঃ নবী-রসূলগণ, উলামাগন এবং শহীদগণ। আরো একটি হাদীসে রসূল (সাঃ) বল্লেন, "তাঁর রাহে রক্তপাত ছাড়া আর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে এত বেশী পছন্দনীয় নয়।"

শাহাদাত হচ্ছে সমাজদেহে, বিশেষতঃ রক্তশূন্যতায় ব্যাধিগ্রস্ত সমাজদেহে রক্ত সঞ্চালনের একমাত্র উপায়। শহীদই হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি যিনি সমাজের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত করেন। এখানে একটি কথা স্পষ্ট যে, স্বাভাবিক মৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যু, অপরাধের শিকার হয়ে মৃত্যু অথবা আত্মহত্যার মত ঘৃণিত মৃত্যু কিম্বা মানুষ গড়া কোন মহৎ (?) মতবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মৃত্যুবরণ শাহাদাতের মৃত্যুর সমকক্ষ নয়। একমাত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামরত মৃত্যুই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। যে মুসলমান এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে কিম্বা মৃত্যুকে বরণ করতে ভয় পায় আল্লাহ তাকে অপমানের ভূষণে সজ্জিত করাবেন। যারা সংগ্রামী মনোবৃত্তি এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তারা অপমান, দুর্ভাগ্য ও অসহায়তায় নিমজ্জিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "সকল কল্যাণ তরবারী এবং তার ছায়াতলে নিহিত।"

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ আমার অনুসারীদের সম্মানিত করেছেন তাদের ঘোড়ার খুরের জন্যে এবং তাদের তীরের লক্ষ্যের জন্যে।" -এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে মুসলমান জাতি হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। সে মুজাহিদ তৈরী করে। রসূল (সাঃ) বলেন, "যে কখনো জিহাদ করেনি এমনকি জিহাদ করার কথা চিন্তা করেনি, সে এক ধরনের মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করবে।" তিনি আরো বলেন, শহীদকে কবরে কোন প্রশ্ন করা হবে না। শহীদের মাথার উপর তরবারীর ঝলকানি তাঁর পরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট।"

ইসলামের প্রাথমিক যুগের শহীদ হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ), যাকে "শহীদদের সর্দার" বিশেষণে ভূষিত করা হয়। তার থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর চলতি সভ্যতার সর্বশেষ দিন পর্যন্ত যে সকল মুসলমানগণ আল্লাহর রাস্তায় জীবন প্রদীপ নিভিয়েছেন তাঁরা সকলেই শাহাদাতের পূর্বে কাঙ্খিত 'স্বর্ণ তরী' অর্থাৎ শহীদ হবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, শহীদ মুন্সী আঃ হালিমের ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লেখা

www.pathagar.com

এই পবিত্র ইচ্ছার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি শাহাদাতের অনেক আগেই লিখেছিলেনঃ

"যেখানে রয়েছে আমার বড় ভাই শহীদ আঃ মালেক, শহীদ সাব্বির, শহীদ হামিদ, শহীদ আসলাম, শহীদ শফিক, শহীদ আঃ রহিম, শহীদ লিটন আমিও তো যেতে চাই- যাবো তাদের ওখানে। শহীদী মিছিলে আমিও আসছি। শাহাদাত আমার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস।" - (শহীদ) আঃ হালিম।

ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক শহীদই ছিলেন তার সময়কার সহযোদ্ধাদের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞান ও চিন্তা সম্পন্ন ব্যক্তি। শাহাদাতের শপথ তাদেরকে অদ্ভুত এক আধ্যাত্মিক জগতের ঠিকানা দিয়েছিল। তাদের দর্শন এবং কর্মপ্রেরণা ছিল অন্যের থেকে ব্যতিক্রম। শহীদ হবার আকাঙ্খা যে যত প্রবল তার উদাহরণ মেলে "সফিনাতুল বেহার" পুস্তকে। সেখানে বদরের যুদ্ধের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে। তার নাম ছিল খেছুমা (বা খছিমা)। তিনি এবং তাঁর ছেলে উভয়ই যুদ্ধ করে শহীদ হতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারী করে সমাধান করা হয়। লটারীতে ছেলে জিতে যায় এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যুদ্ধে তার ছেলে শহীদ হয়।

বিস্তারিত আলোচনা এবং আল কোরআন ও হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকারের মুসলমান হিসাবে নিজেকে দাবি করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আল কোরআন ও হাদীসকে স্বীকার করে তবে সে শাহাদাতকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের জীবন দিতে দ্বিধা করবে না।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির এর আদর্শ এ দেশে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং এই আদর্শ ইসলামেরই আদর্শ। এই লক্ষ্যে উজ্জীবিত হয়ে আত্মত্যাগ যদি তথাকথিত প্রথিতদশা বুদ্ধিজীবীদের চোখে নেতাদের মন্ত্রে 'ব্রেনওয়াশ' এর মাধ্যমে আত্মত্যাগ হয় তবে প্রত্যেক মুসলমান যুবক-যুবতীর উচিত স্বেচ্ছায় ব্রেনওয়াশ করিয়ে নেওয়া। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানেই শহীদী খুন ঝড়েছে সেখানকার মাটি পরবর্তীতে পরিণত হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটিতে। জন্ম দিয়েছে শাহাদাতের আকাঙ্খায় বদ্ধ-পরিকর আরো যুবক প্রাণ। আর এই কারণেই শিবির কর্মীরা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পিছুপা হয় না। বাস্তবতার দিক থেকে আজকের দুঃখের অন্ধকার রাত্রি শেষে যেমন আগামীকালের সূর্যোদয় সত্য তেমনি মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু কে বরণ করা এক দল মুজাহিদদের জন্য সফলতার গৌরব নিশ্চিত সত্য। কারণ বিভিন্ন মার্শালদের মতে "সুইসাইড স্কোয়াড" কখনো ব্যর্থ হয় না।

আগামী শতাব্দী ইসলামের, এই নৃশংস গণহত্যার পরিণতি হিসেবে অবশ্যই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া জীবনকে যদি অনন্ত কাল ধরে রাখা যেত তবে অন্য কথা। যদি সভ্যতার উলঙ্গ স্রোতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নিজেকে কেউ ভাসিয়ে দেন তবে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে দেখে জীবনের শেষ গোধূলী লগ্নে আপনার প্রগতিশীল চেতনা হঠাৎ গতি কমিয়ে ধাক্কা খাবে কঠিন বাস্তবতার দেওয়ালে। জীবনের ক্ষনস্থায়িত্বের শাশ্বত সত্য উন্মোচিত হবে আপনার অনুভূতিতে। তখন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। আপনার চারপাশে প্রতিধ্বনিত হবে কবি আহমেদ ইউসুফের কণ্ঠস্বর-

জীবন সুন্দর-
আকাশ, বাতাস পাহাড় সমুদ্র
সবুজ বনানী ঘেরা প্রকৃতি সুন্দর।
আর সবচেয়ে সুন্দর- এই বেঁচে থাকা।

তবুও কি আজীবন বেঁচে থাকা যায়?
বিদায়ের সানাই বাজে
নিয়ে যাবার পাল্‌কি এসে দাঁড়ায় দুয়ারে।

সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে
এই যে বেঁচে ছিলাম-
দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেতে হয়- সবাইকে
- অজানা গন্তব্যে।

হঠাৎ ডেকে ওঠে নাম না জানা পাখী
অজান্তেই চমকে উঠি
জীবন, ফুরালো নাকি?

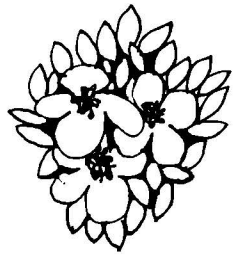

www.pathagar.com

আজও এলোমেলো

মুন্সী আব্দুল হাফিজ কচি

একটি বাড়ী। একটি পরিবার। আর এই পরিবারেই জন্ম হয়েছিল মুনসী আবদুল হালিমের । আর আমি কচি তারই ছোট ভাই। আমরা ছিলাম ছয় ভাই। বোন পাচ। ভায়ের মধ্যে হালিম ভাই ছিল চতুর্থ। আর আমাদের এই এগারো ভাই বোনদের মধ্যে থেকে তিনি চলে যাবেন-- আমরা ভাবিনি।

সত্যি কথা বলতে কি আমি ব্যাক্তিগত ভাবে আমার অন্য পাঁচ ভায়ের ভিতর আবদুল হালিম ভাই কে একজন ব্যাতিক্রম,একজন স্বতন্ত্র,একজন অনন্য ভাই হিসেবে মনে মনে নির্বাচিত করে ছিলাম। আর এজন্যেইতো আমি নিজে কোন সমস্যায় পড়লে সর্বপ্রথম তারই কাছে ছুটে যেতাম।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত কারও কাছে প্রাইভেট পড়িনি। বাড়ীর অন্য কারো কাছে নয় হালিম ভায়ের কাছেই সমস্ত বই পড়তাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে তিনি আমাকে প্রত্যেকটা বিষয় নোট করে দিতেন। সুন্দর সুন্দর নিয়মে অংক করাতেন। আর তার জন্যই তো আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে এক থেকে পাঁচের ভিতর রোল করতে সক্ষম হয়েছি। পাশা পাশি ভাল রেজাল্ট করলেই তিনি আমাকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিতেন।

"কথা কম কাজ বেশী"-- আমি কথা বেশী বললে রাগ করে তিনি এ কথাটি প্রায়ই বলতেন । কথাটি এখনও মনে দোলা দেয়।

আবদুল হালিম ভাই আমাকে সর্বদা পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলতেন। শুধু কোরআন পাঠ নয় -- অর্থসহ তাফসীর পড়তে বলতেন।

হালিম ভায়ের এটুকুই নয়,কোরআন তেলোয়াত শুধু আমার কাছে নয় সর্ব মহলে প্রশংসিত। যার উৎকৃষ্ট প্রমান গত ৯৩ র পবিত্র ঈদ উল ফিতরের নামাজ। বৃষ্টির কারনে নামাজের অনেক বিলম্ব এবং প্রথম জামাত হয়ে দ্বিতীয় জামাতের জন্যে সকলেই সিদ্ধান্ত নিল কিন্তু ইমাম সমস্যা। সর্বসম্মতভাবে আবদুল হালিম ভাইকে নির্বাচন করল। অদ্ভুত কোরআন তেলাওয়াতের সাথে নামাজ পড়ালেন। সকলেই অবাক হলো এতো সুন্দর তেলাওয়াত । এরকম ব্যতিক্রম কোরআন তেলাওয়াত আগে কখনও শুনিনি।

আগষ্টে এস. এস সি ৯৩ রেজাল্টের পর বি এল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে কোচিং করতে লাগলাম। পড়াশুনা ও যাতায়াতের সুবিধার জন্যে মাকে চিঠি লিখলেন-- কচিকে হলে পাঠিয়ে দাও। চলে গেলাম হলে। তাই ৩০৬ নং রুমে(হাজী মুহসীন হলে)। প্রায় ১২ দিন একই বেডে থাকতাম । তিনি সবার সংগে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন, খুবই ভাল লাগত।

১৪ই সেপ্টেম্বর কোচিং নিয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত হলে কলেজ কতৃপক্ষ অনিদিষ্ট কালের জন্যে কলেজ বন্ধ ও হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। যার ফলে আমি বাড়ী চলে আসলাম।

১৮তারিখে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে কলেজে যাওয়ার সময় কলেজে ১নং গেটে ভাইয়ের সংগে আমার দেখা হলো। অল্প কথা হয়েছিল এবং ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বিকালে মিছিলের জন্যে কলেজে আসতে বলেছিল । তার কথা মত আমি বিকাল ৩টার দিকে কলেজে গেলাম।

কলেজে যেয়ে ভায়ের সংগে তখনও দেখা হয়নি । কলেজ পুকুর চত্বরে বন্ধু পিংকুর সংগে দেখা। সে আমাকে বলল, তোকে হালিম ভাই ডাকছে মসজিদে কথা বলবে। (আর এটাই ছিল তার সংগে আমার শেষ কথা কে জানে?) আমি শুনে খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলাম কলেজ মসজিদে।

তখন তিনি ওযু করছিলেন। আমার কাছে অনেক কথা শুনল । বাড়ীর খবরাখবর বললাম । সর্বশেষ আমি বললাম মা বাড়ী যেতে বলেছে। তখন তিনি আমাকে একটু চিন্তা করে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়েই বলেছিলেন- "মাকে বলিস, কলেজে খুব কাজ, সময় পাচ্ছিনা কাজ কমে গেলে ২০ তারিখের দিকে যাবো।

এই কথা বলে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। আর সেই থেকে আমি আজও এলোমেলো।

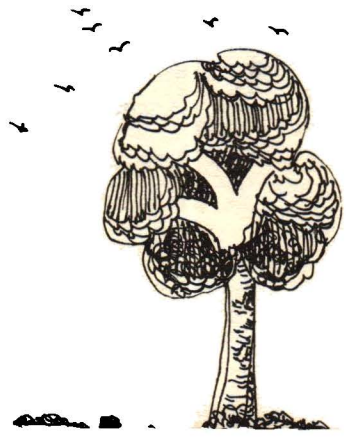

www.pathagar.com

শহীদ

মোশাররফ হোসেন খান

**[আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাঁদেরকে মৃত বলো না।
প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত।" আল বাকারাঃ১৫৪]**

যাঁদের হৃদপিন্ড ঝাঁঝরা করেছো
কিংবা মস্তক কেটে দ্বিখন্ডিত করেছো
চেয়ে দেখ, তাঁরা সবাই নক্ষত্র হয়ে গেছে।

খন্ডিত মস্তকগুলো বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে আসে পৃথিবীতে।
খন্ডিত মস্তক থেকে উৎসারিত হয় ভোরের সূর্য।
এবং সূর্যের উত্তাপে পুনরায় জমাটবদ্ধ হয় খন্ডিত দেহ।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, বিমান, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়। ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের ঘুমের দরোজায় অনড় পর্বত।

ঐ হিংস্র চোখে তোমরা আর ঘুমুতে পারবে না কখনো।
ঐ পাষন্ড হৃদয়ে আর কখনো দেখবে না সবুজ স্বপ্ন।
আর কখনো পাবে না তোমরা প্রশান্তির আরাম।

তোমাদের অনুভবে, ভাতের থালায়, দৃষ্টির সীমানায়,
ঘুমের বিছানায় শহীদের অগ্নিময় প্রশ্বাস।
ইলেকট্রিক করাতের মতো তারা এখন তোমাদের মাথার ওপর।
এবং চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের মুখোমুখি প্রজ্জ্বলিত লাভা।

তোমাদের পাজর ভেদ করে ঢুকে গেছে যে দুর্ধর্ষ বাতাস
সেই বাতাসের সাথে মিশে আছে
শহীদের ঘৃণার থুথু, দর্পিত প্রশ্বাস।
তোমাদের হলকুমের ওপর একটিই মাত্র অস্তিত্ব–
সেটা হলো শহীদের অকম্পিত পা।
আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, বিমান, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়। ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরে না কখনো।

কাদেরকে পরাজিত করবে?
দেখ, পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র প্রার্থনা–শহীদ।
শহীদ হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো প্রার্থনা নেই।
এবং দেখ, সমুদ্রের বুকে যে দুর্বিনীত ঢেউয়ের গম্বুজ–
ওটা ঢেউ নয়, শহীদের অন্তিম ক্রোধ।
কাদেরকে পরাজিত করবে?
রক্তের তরঙ্গের ওপরেও বেঁচে থাকে
'শহীদে'র যৌবনদীপ্ত প্রাণী
শহীদেরা মরে না কখনো।

www.pathagar.com

আলোক বর্তিকা

মোহাম্মদ বদরুল হায়দার চৌধুরী

সূর্যের উদয় আর অস্তে পৃথিবীর বিন্যস্ত গতিতে হারিয়ে যায়
বহু প্রাণ, অসংখ্য ত্যাগী জীবন যাদের সত্যের পথে ব্যস্ত।
ওরা ছিলো দ্বিধাহীন সৈনিক ন্যায়ের জিহাদে
জালিমের কণ্ঠ ছিঁড়ে, তপ্ত বালুরাশি ভেদ করে
গজিয়ে উঠা সবুজের মর্মর ধ্বনি
ওদের প্রিয় সংগীত
আর স্রোতের বিপরীতে নৌযানের অগ্রযাত্রা
ছিল ওদের চলার ছন্দ।
পবিত্র রক্তে সিক্ত এ জমিনে দ্বীন কায়েমের সংগীন
আজ বাজে হতাশার অন্ধকার ভেঙে মুমিনের কাফেলায়
মুক্ত বিহঙ্গে ঐ যে আসছে সকল শহীদেরা
আলোক বর্তিকা সেজে।

আমানের জন্য

মু, হারুন বিন আহাদ

শহীদ আমানের বেদনার স্মৃতি চিন্তাগুলো
মায়ের বুকে সর্বক্ষন রক্ত ঝরায়–
যে মুখের রেখায় রেখায় খুশীর মৌমাছি দল
একদা গুঞ্জরিত হতো–
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি রাত স্বপ্নের নক্শী কাঁথায় জড়াত সুস্নিগ্ধ–
সে মুখায়ব আজ যেন চৈত্রের দাহে ফেটে চৌচির মমতায়,
ভীষন খরায় জ্বলছে ওর বুকে ফসলের জমি
ফলের বাগান অরণ্যানী–
ছায়া নেই, আলো নেই, পাখীদের গান নেই–
এক সর্বনাশী ঝড়ের তান্ডবে থমকে গেছে বিষণ্নতায়।
ওর মায়ের মুখ খানি ঘিরে–
সম্মুখে পেছনে দানবের মত ভয়াল আঁধার
পায়ের তলায় কি ভীষণ ফাটল–
কোথায় দাঁড়াবে ও এখন।
ওর দুঃখর বন কি বিষ– নীল আষাঢ়ের ঢল?
ওর বেদনার রং কি বিবর্ণ গোলাপ–
একটি পাঁপড়ি অকালে ঝরে গেছে
বিচূর্ণ আশাহত নির্মমতার আঘাত লেগে?
শহীদ আমানের হন্ত্যারা কি–
মায়ের আর্তি মুছে দিতে পারবে কোন দিন?
আমানের আর্তি সুকুমার মুখখানি ঘিরে
মায়ের ক্রন্দন, পাখী হয়ে ছরছেই দিনরাত।

তিন শহীদের এ আযান

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

তিন শহীদের এ আযান
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
একটি শাশ্বত বিপ্লবের মহান ধারায়,
সংগ্রাম সংঘাতের উদ্দাম ছড়াতে
ফুলকুঁড়িদের বিধ্বস্ত শিরায় শিরায়।।
তিন শহীদের এ আযান,
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
গ্রেনেড বুলেট কামানের মতো,
কল্লোলিত সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের মতো,
সবকটি দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য।
তিন শহীদের এ আযান,
আমি আজ পৌঁছে দেবো–
সাম্য–সংহতির মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে–
সকল মানুষকে
এক অদ্বিতীয় শ্রষ্টার সান্নিধ্যে
একাকার হয়ে যাওয়ার জন্যে।

তাজা খুন

জেসমিন নাহার জেবু

যখনই স্মরণ হয়–
প্রতিভাদীপ্ত, মিষ্টভাষী, সদা হাস্যোজ্জল,
হালিম, রহমত, বিমান, আমান ভাই আর নেই।
তখনই চলে যায়– বিএল কলেজের করিডোর অথবা পবিত্র মসজিদ,
রক্ত মাখা দূর্বা ঘাসগুলোর দিকে।
ভোরে উঠবে সারা পৃথিবীর সবটুকু বাতাস
উঠবে না শহীদ হালিম, রহমত, বিমান আর আমানের বুক।
আযান আসবে মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে,
আসবে না শুধু হালিমের কণ্ঠে নারায়ে তাকবীরের শ্লোগান।
তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে ইসলাম বিরোধী দল,
শান্ত হলো কশাই আজাদ, ফারুক, হাফিজ অপশক্তির দল।
ক্রোধে ফেটে পড়ল সমস্ত বাংলাবাসী,
মায়ের আদর, ভাইয়ের ভালবাসা কত যে রংগীন স্বপ্ন।
সব কিছু ম্লান করল ব্রাসফায়ারের ঝনঝানানীতে।
চলে গেলো শহীদ হালিম রহমত যোগ্য পুরস্কার নিতে,
রক্তাক্ত হয়ে উঠল বিএল কলেজ ক্যাম্পাস,
শাশা ঢালা প্রাচীর গড়ল যাঁরা
তাঁরাই শহীদ, তাঁরাই খোদার সেনা।

www.pathagar.com

শোক যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মদদ জোগায়

- শহীদ হালিমের পিতা

জনাব মুন্সী মোহাম্মদ মহানগরী খুলনার উপকণ্ঠে দামোদর গ্রামের একং ন সম্ভান্ত বাসিন্দা। ব্যাক্তিগত কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্টাবান এই বর্ষীয়ান মানুষটি গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে অনন্য সাফ্যলের অধিকারী এই বয়ঃবৃদ্ধ পিতার সাফল্যের মুকুটে আরও এটি অমুল্য রত্ন সংযুক্ত হয়েছে। তাহলো তিনি একজন শহীদের গর্বিত পিতা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছেন। আর যার কারনে আজ তিনি সবার পিতার মর্যদায় সমাসীন হয়েছেন তিনি খুলনার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের আকাশ থেকে অকালে ঝরে যাওয়া উজ্জল নক্ষত্র শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম।

অত্যন্ত প্রান খোলা ও সদালাপী এই পিতা সন্তান হারানোর বেদনায় কাতর হলেও বাংলাদেশে তথা বিশ্বব্যাপী ইলামী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা যে কত যুক্তি নির্ভর এবং সময়োপযোগী তা সহজেই অনুমেয়। তার কথায় সন্তান হারানোর ব্যাথার চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে তার পেরেশানীই মূর্ত হয়ে উঠেছে অধিক মাত্রায়। তিনি বলেন, "বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধ যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তাদের শহীদদের কথা মনে করে শোকাভিভূত হলে চলবেনা। বরং শোক যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মদদ জোগায় সেদিকেই খেয়াল রাখতে হবে। ইয়াকীন দৃঢ় রাখতে হবে। তবেই সফলতা আসবে।"

তিনি বলেন " হালিম ছিল অত্যন্ত বিচক্ষন ছেলে। রমজান মাসে ইফতারীর জন্যে যে আজান দিত তা আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম । তার আজান শুনে গ্রামের লোকেরা ইফতারী করতো।"

শহীদ হালিম ভাইয়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার চট্টপধ্যায় ও সহকারী শিক্ষক সন্তোষ কুমার বিশ্বাস তাদের ছাত্রের জন্যে গর্ব অনুভব করেন। তারা বলেন সত্যবাদী ও অসাধারন ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন একজন ছাত্র ছিল হালিম। আমরা তার জন্যে গর্বিত।

তোমরা আমার রহমত কে এনে দাও

শহীদের আম্মা

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা সদর থেকে ৪/৫ কিঃ মিঃ হেটে নিভৃত পল্লী দোহার গ্রামে যখন পৌছাই তখন প্রায় মধ্য দুপুর। শহীদ রহমতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত গ্রামের মসজিদের পাশেই তার কবর। সাদা মাটা হলেও অত্যন্ত পরিচ্ছন। গ্রামের সবারই যেন একান্ত নিজের সম্পদ এ কবরটি।

একটু এগিয়ে মাটির প্রাচীর ঘেরা ঘরটির সামনে পৌছাতেই এক অশীতিপর বৃদ্ধা সামনে এসে কান্নায় ভেংগে পড়লেন। মাথায় এবং গালে হাত বুলিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন "এই মুখ একেবারে আমার রহমতের মত। আমার রহমতকে তোমরা কোথায় রেখে এসেছো।" শহীদ রহমত ভাই আর আমি এক সংগে পড়তাম শুনে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলেন। কান্নার বেগ কমে এলে বললাম আপনিতো শহীদের মা। আপনার কাদা উচিৎ নয় । শহীদ জননী বললেন, "তাতো বুঝি বাবা কিন্তু মনতো মানে না। আমার রহমত খুব ভাল ছেলে ছিল। তোমরা ওর মত কাজ করে ইসালাম প্রতিষ্ঠা কর।"

শহীদের সেজো ভাই রজব আলী যিনি একটি ছোট খাট চাকুরি করেন বললেন,"রহমত শহীদ হয়েছে এতে আফসোস নেই। আফসোস হলো এ এলাকার ইসলামী আন্দোলন একজন যোগ্য নেতা হারালো।" তিনি বললেন, "রহমত সারা জীবন কষ্ট করে পড়া লেখা করেছে। নিয়্যত করেছিলাম সামনের মাস থেকে ওকে কিছু টাকা অন্তত হাত খরচের জন্যে পঠাবো। সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেলো। যদি এদেশে ইসলামী বিপ্লব হয় তাহলে বলতে পারবো এ বিপ্লবের পিছনে আমার সহোদর রহমতেরও রক্ত রয়েছে। দোয়া করি আপনারা সফল হন।"

ছাত্র শিবিরের সব ছেলেরাই আমার ছেলে

- শহীদ আমানের মা

শহীদ আমানুল্লাহ আমান ভাইয়ের বিধবা মা মোসাম্মৎ মনোয়ারা খাতুন বললেন, "আম্মার আমানের কোন জিনিসের উপর লোভ ছিলনা। আমাকে বিরক্ত করত না। ছোটবেলায় ওর আব্বা মারা গিয়েছে। ভাই বোনদের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করতো। কোন খারাপ কাজ করত না। খারাপ কাজে সহযোগীতাও করত না। খেলাধুলা ভাল বাসত। বন্ধুদের সাথে মিলে মিশে চলতো । ভাল গজল গাইত। সে তোমাদের টাইফুন শিল্পি গোষ্ঠীর সদস্য ছিল। শহীদ হওয়ার ৬ মাস আগে বলেছিল আমি যদি শহীদ হই তোমার কোন অসুবিধা হবেনা। তার ভিতর সব সময় শহীদ হওয়ার প্রেরনা কাজ করতো।"

শহীদ শোকাতুরা মা আরও বললেন,"আমি নিশ্চিত যে আমার ছেলে শহীদ হয়েছে। শিবিরের ছেলেরা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করে এতে আমি খুবই খুশি। ছাত্র শিবিরের সব ছেলেরাই আমার ছেলে।"

www.pathagar.com

আমার সন্তানের চেয়ে ওদের ভাই হারানোর বেদনাই বেশী

-শহীদ বিমানের পিতা

ামি বুঝতে পারিনি আমার বিমান ইসলামের পথে এতো এগিয়ে গছে।' আজীবন আওয়ামীলীগের একজন নিবেদিত কর্মী, টুঙ্গীপাড়ায় শখ পরিবারের সন্তান শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের পিতা শেখ হম্মদ ইদ্রীস কান্না জড়িত কণ্ঠে একথা বলেন। তিনি বললেন স্কুল ীবন থেকেই বিমানের ব্যক্তিগত জীবনে নামায, সততা ও ইসলামের তি আগ্রহ ছিল। পরিবারে আমরা নিজেরা নিয়মিত নামায রোজা না রলেও বিমানকে আমি কখনো নামায কাজা করতে দেখিনি। তখনও ুঝিনি এর কি কারণ। সে শুধু নিজেই নামায পড়তো না আর ন্ধুদেরকেও এ পথে ডাকতে দেখেছি। যখন আমি জানলাম যে সলামী ছাত্র শিবিরে যোগ দিয়েছে তখন তাকে এ পথ থেকে ফরানোর বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার বিমানকে শত চেষ্টা করেও । পথ থেকে ফেরাতে পারিনি। শিবিরকে আর দু'পাঁচটি রাজনৈতিক ংগঠনের মতোই মনে করে আমি তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা রেছি।

াস এসসি তে প্রথম বিভাগে পাশ করার পর আমি তাকে ডিপ্লোমা ঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হতে বলেছিলাম। জবাবে বলেছিলো অবৈধ ায়ের উপর নির্ভরশীল কোন পেশায় সে জড়িত হতে রাজী না। জন্যই পলিটেকনিকে তাকে ভর্তি করা যায়নি। কলেজে ভর্তি হয়ে খন সে শিবিরের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলো তখন তাকে শিবির থেকে ফেরানোর জন্য বললাম 'তুই যদি ছাত্রলীগে যোগদান রিস তাহলে তোকে ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি করার ব্যবস্থা করে দব।' জবাবে জানালো- সে লাইসেন্স- পারমিটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

ামরা টুঙ্গীপাড়ার শেখ পরিবারের সন্তান। আমাদের অস্তিত্বের সাথে াওয়ামী লীগ জড়িত। এই বিমান ও স্কুল জীবন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ া শেখ পরিবারের কারো সমালোচনা সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু ানিনা কোথা থেকে কি হয়ে গেল। আমার ছেলে বিমান আবেগ দিয়ে য় যুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে মালোচনার ঝড় তুলতো। এ নিয়ে ওর ছোট ভায়ের সাথে প্রায়শঃই কথা কাটাকাটি হত। এক কথায় পরিবারের সকলের সাথে তার াদর্শগত পার্থক্যের কারণে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব লেগেছিল। তবে াকে কখনও মুরুব্বীদের সাথে বেয়াদবী করতে দেখিনি। তাকে দেখলে বা আলাপ করলে মনে হত ইসলামও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাজের জন্যই যেন আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

দিনের অধিকাংশ সময় সে বাইরে থাকতো। সাধারণতঃ রাতেই াসায় ফিরতো। কোন দিন ফিরতোও না। জিজ্ঞেস করলে কোন বাব পাওয়া যেত না।

বিমানকে নতুন লুঙ্গি, শার্ট কিনে দিলে কিছুদিন পর তা আর পরতে দেখা যেত না। জিজ্ঞেস করলে চুপ থাকতো। পরে জানা যেত কাউকে দিয়ে দিয়েছে। আমার বাসা হাসপাতালের সামনে হওয়ায় প্রায়ই চিকিৎসার জন্য আসা রোগী বা রোগীদের আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ানোর জন্য বাসায় নিয়ে আসতে দেখতাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাঁপানীর রোগী। একদিন রাতে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে রাতে বিমান বাসায় ফেরেনি। সকালে আসলে তাকে অসুস্থতার কথা বলায় সে বিমর্ষ হয়ে যায়। পরের দিন থেকে রাতে তার জন্য রেখে দেওয়া ঠান্ডা খাবার খেয়ে আমার সুস্থ্যতার জন্য নফল রোজা রাখা শুরু করে। অবশ্য এসংবাদ আমি পরে জেনেছি।

শৈশব থেকে বিমান খুব রাগী ছিল। তার মতের বিপরীত কোন কিছুকেই সে সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু শাহাদাতের কয়েক মাস পূর্ব থেকে লক্ষ্য করেছি রাগের পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা ওর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। ওকে দেখতাম যুক্তিতর্ক দিয়ে ওর থেকে বয়সে প্রবীণদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হতো। বিমান যেদিন শহীদ হয় সেদিন ইফতার করে বাসায় বিশ্রাম করছিলাম তারাবী পড়তে যাবো এমন সময় হঠাৎ করে কারা যেন খবর দিয়ে গেল- বিমান Accident করে হাসপাতালে এসেছে। আমি বাদে বাড়ীর সবাই দৌড়ে হাসপাতালে ছুটে যায়। তখন আমি বাড়ীতে একা। অনেকক্ষণ যাবত কেউ ফিরে আসছে না দেখে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এমন সময় ওর বড় বোন এসে Accident মারাত্মক নয় বলে জানায়। কিন্তু সবাই না ফিরে আসাতে আমার একথা বিশ্বাস হয়নি। তখন নিজেই হাসপাতালে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আমার বিমান অচেতন অবস্থায় মাথায় রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে আছে। কেন জানি আমার মনে হলো ও বোধ হয় আর আমাকে আব্বা বলে ডাকবে না। ইতিমধ্যে ডাক্তারদের সাথে আলাপ করে এ বিষয়ে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হলো। এর মধ্যেই হাসপাতালে ও সঙ্গীদের ভীড় জমে উঠেছে। তাদেরই একজন রাশেদের দেয়া রক্ত ওর শরীরে চলছিল। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে রাত ১২-০৫ মিঃ আমার বিমান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেল। ইন্না লিল্লাহি .....।

সারারাত ধরে ওর বোন এবং শিবিরের ছেলেদের বিলাপ ধ্বনী আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিল। শিবিরের ছেলেদের কান্না দেখে আমার মনে হচ্ছিল আমার সন্তান হারানোর বেদনার চেয়ে ওদের ভাই হারানোর বেদনাই বেশী। সকালে ওর শত শত সঙ্গীরা ওদের শহীদ বিমান ভাইয়ের লাশ পোষ্ট মর্টেমের জন্য পুলিশকে নিতে বাধা দিল। কারণ ওরা ওদের সঙ্গীর লাশের অবমাননা হতে দিতে চায় না।

পরে নেতাদের হস্তক্ষেপে ওরা শান্ত হয়। জানাজার জন্য দিনভর প্রখর রৌদ্রে অপেক্ষমান বিমানের হাজার হাজার সাথীদের সামনে আবেগ জড়িত কণ্ঠে শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানের পিতা বললেন, "বিমান হারিয়ে যাওয়ায় আমি শোকাহত কিন্তু বিমানের হাজারো সাথীর মাতম দেখে আমি শোক প্রকাশ করতে পারছি না। বিমানকে হারালেও তোমরাই আমার সন্তান। তোমাদের মাঝেই আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি।" জানাজার পর কলেমা শাহাদাৎ উচ্চকিত শহীদের কফিন বাহী মিছিল দেখে শহীদের পিতা বললেন, "জানাজায় তো এতো লোক দেখিনি সবাই যেন একই উচ্চতার একই পোশাকের একই চেহারা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শহীদের লাশের সাথে এরা আল্লাহর ফেরেশতা।"

www.pathagar.com

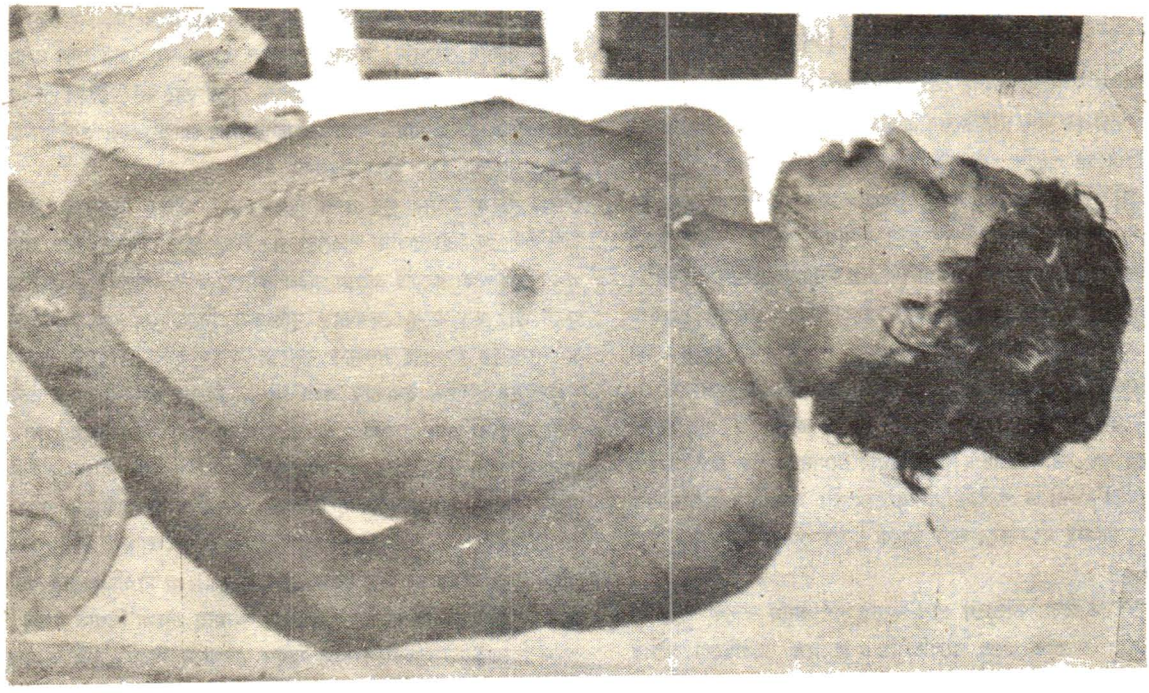

গোসলের পর রক্ত ধুয়ে গেছে কিন্তু নির্মমতার চিহ্ন সুস্পষ্ট

ঢাকার রাজপথে শাহাদাতের প্রতিবাদে মিছিল

www.pathagar.com

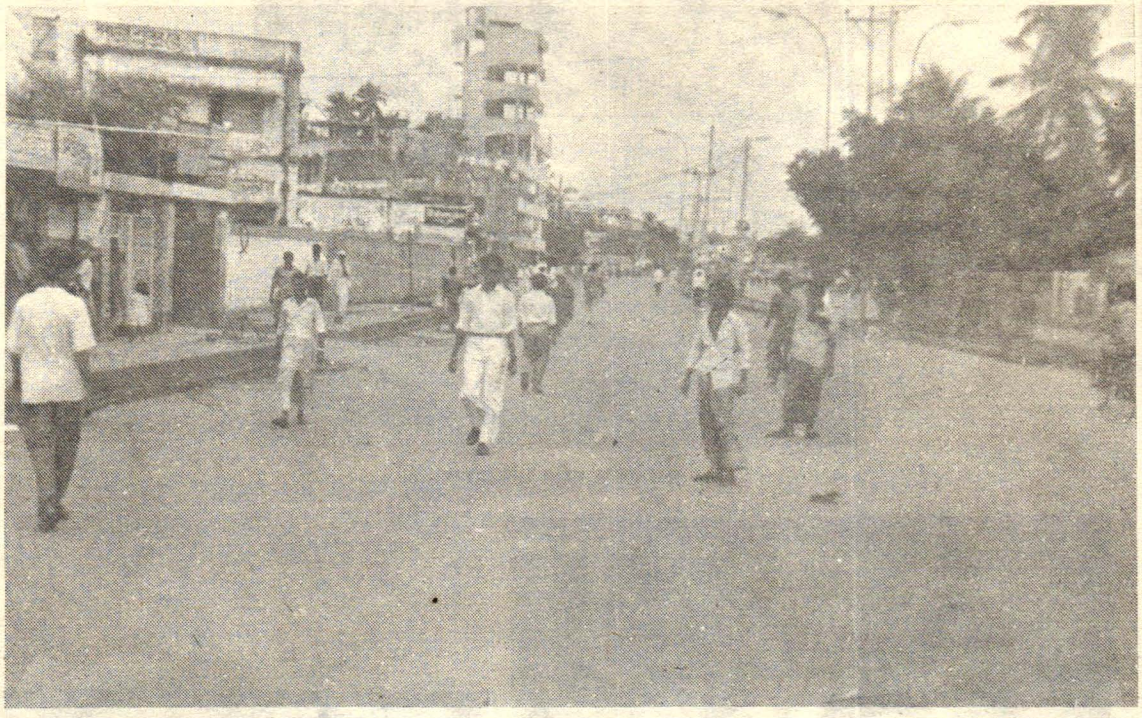

হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মহানগরী খুলনায় ২২শে সেপ্টেম্বর '৯৩ হরতাল

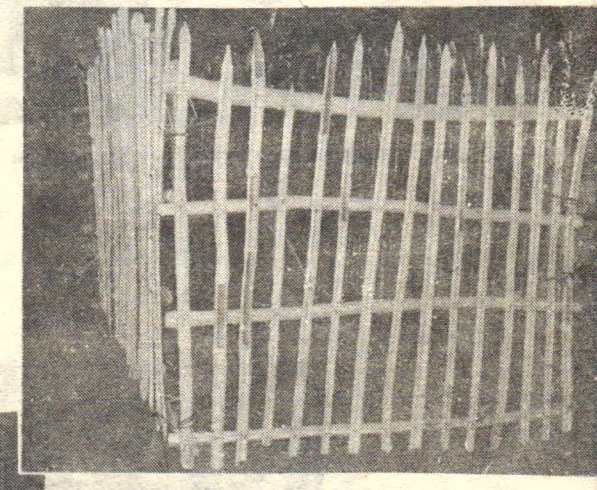

এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

দোহার নিভৃত পল্লীর এখানেই শায়িত শহীদ শেখ রহমত আলী

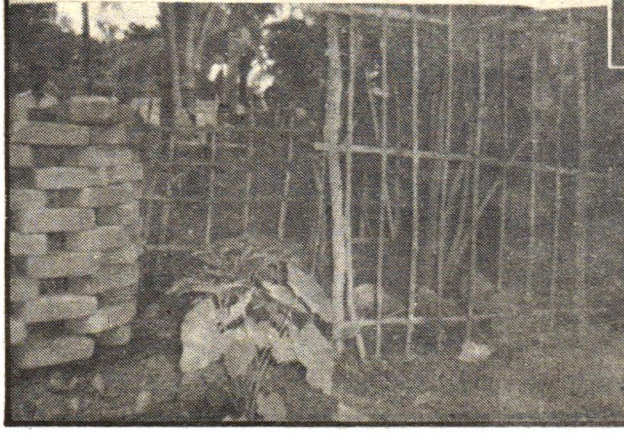

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম

এখানে চির নিদ্রায় শায়িত শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান

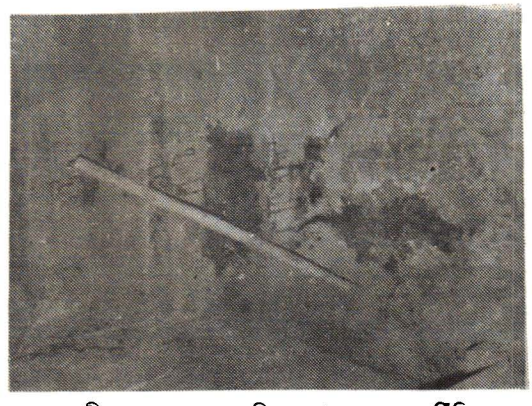

শহীদ আমানের রক্তে ভিজে গেছে মাদ্রাসার সিঁড়ি

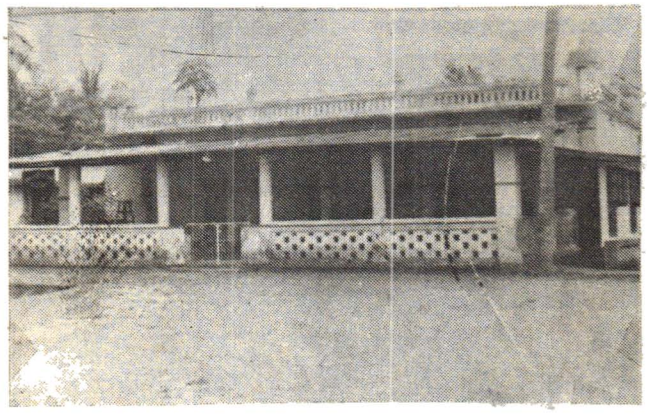

এই সেই মসজিদ যেখানে জবাই করা হয় শহীদ হালিমকে

www.pathagar.com

গুরুতর আহত শিবির নেতা আব্দুর রহিম

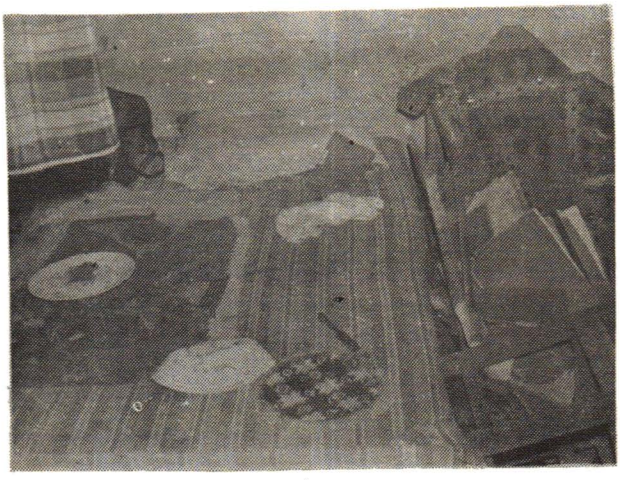

খাবার থালাতেই রয়ে গেছে
কিন্তু আমান চলে গেছে জান্নাতে

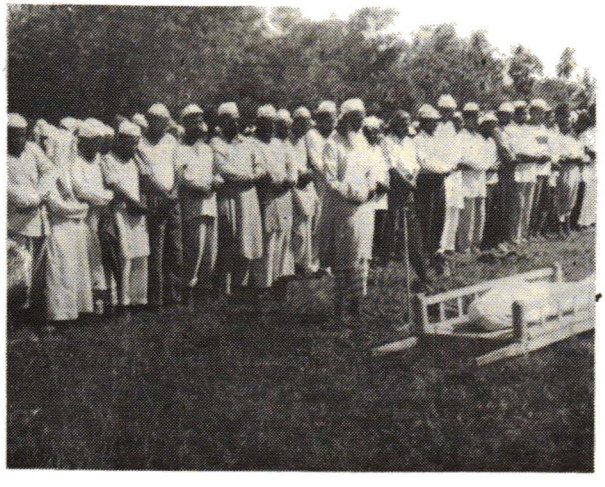

শহীদ হালিমের জানাজা

গুলীবিদ্ধ আহত শিবির নেতা মাকসুদুর রহমান মিলন

আহত শিবির কর্মী দেলোয়ার হোসেন

এই পুকুরেই নিক্ষেপ করা হয় শহীদ হালিমকে

www.pathagar.com

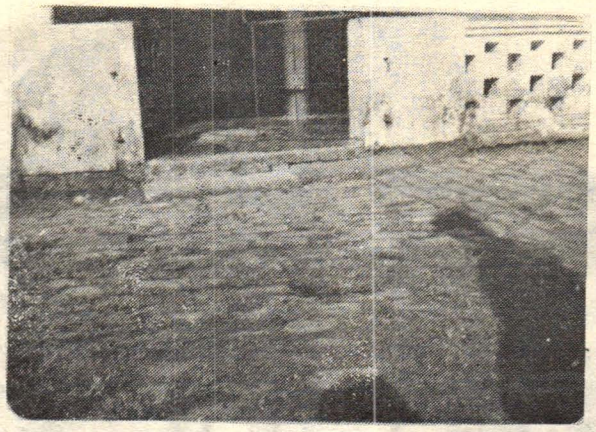

বিএল কলেজের মসজিদ– সামনে চাপ চাপ রক্ত

ভাংচুরের শিকার শহীদ হালিম ভাইয়ের কক্ষ

শহীদ শেখ রহমত আলীর কক্ষ

শহীদ আমানের স্বজনেরা

শাহাদাতের মাত্র ৯ দিন পূর্বে খুলনা প্রেসক্লাবে
সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন জিএস হালিম ভাই

www.pathagar.com

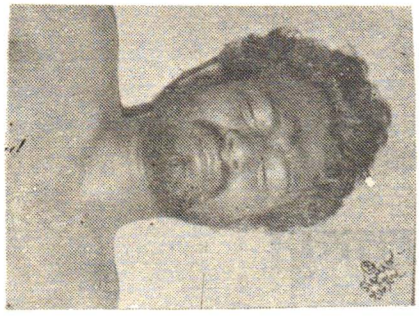

বিএল কলেজের আহত সেক্রেটারী মাহফুজুর রহমান

কফিনের কাছে শহীদ হালিমের মাতা

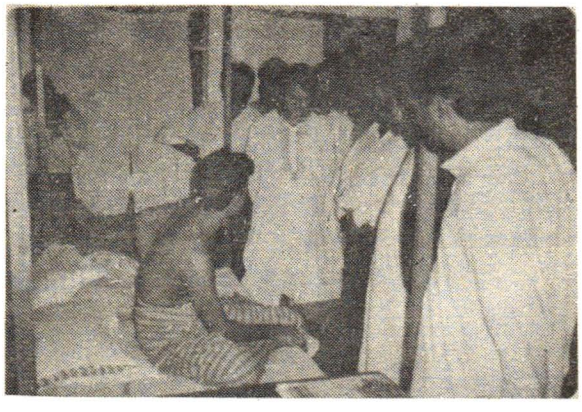

গেটে গুলীবিদ্ধ হাফিজ ভাইয়ের শয্যা পার্শ্বে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

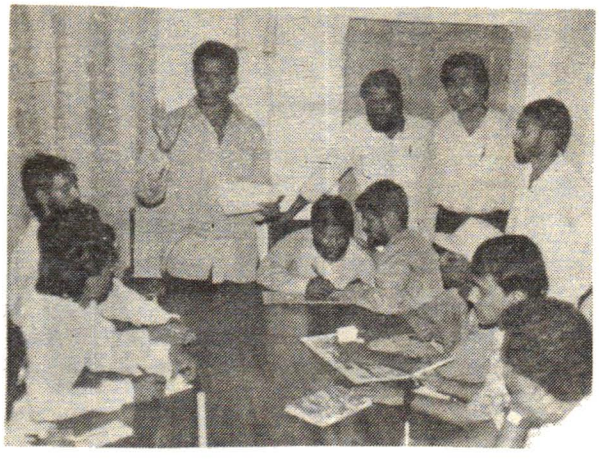

হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আহূত সংবাদ সম্মেলন

শহীদ হালিমের কবর গাহে জামায়াত শিবির নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

সীমিত আয়ের চাকুরীজীবীদের জন্য
ইসলামী ব্যাংকের

গৃহ সামগ্রী প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় ফ্রিজ, টিভি, সোফাসেট, খাট, আলমিরা, ওয়ারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল, সেলাই মেশিন, টোস্টার, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, মোটর সাইকেলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের ঢাকাস্থ রমনা, ফার্মগেট, নিউমার্কেট ও মিরপুর শাখা এবং চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাখার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

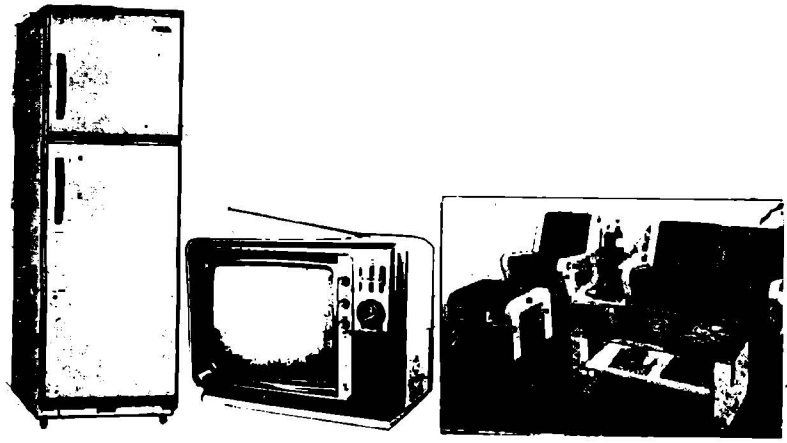

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
একটি কল্যাণমুখী ব্যাংক

www.pathagar.com